আব্বাস আলী খান

মৃত্যু যবনিকার ওপারে

আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৩৬

৯ম প্রকাশ (আধুঃ ৪র্থ প্রকাশ)

জমাদিউস সানি	১৪২৬
শ্রাবণ	১৪১২
আগস্ট	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MRITTU JABANIKAR OPARE by Abbas Ali Khan. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

উৎসর্গ

আমার আম্মা ও আব্বা যাঁদের অপত্য স্নেহবাৎসল্যে আমি দুনিয়ায় চোখ খুলেছি, মানুষ হয়েছি এবং আমার ছোট চাচা যিনি আমার বিদ্যাচর্চার জন্যে সবিশেষ যত্ন নিয়েছেন এবং আমার 'আহল ও আয়াল' তাঁদের সকলের মাগফেরাতের জন্য গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হলো।

—গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের কথা

যেসব আকীদাহ্ বিশ্বাসের উপরে ঈমানের প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অন্যতম। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে, আল্লাহ, রসূল, আল্লাহর কেতাব প্রভৃতির প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসই জন্মে না। উপরন্তু প্রবৃত্তির দাসত্ব ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে নেক আমল করতে হলে আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

আবার আখেরাতের প্রতি যেমন তেমন একটা বিশ্বাস রাখলেই চলবে না। বরঞ্চ সে বিশ্বাস হতে হবে ইসলাম সম্মত, কুরআন-হাদীস সম্মত। এ বিশ্বাসে থাকে যদি অপূর্ণতা, অথবা তা যদি হয় ভ্রান্ত, তাহলে গোটা ঈমান ও আমলের প্রাসাদ ভেঙে চূরমার হয়ে যাবে।

ইসলাম ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞানলাভ করার তওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, তাতে করে আমার এ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, আখেরাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে গেলেই দুনিয়ার জীবনে খোদার পথে সঠিকভাবে চলা সম্ভব হবে। উপরন্তু মনের মধ্যে পাপ কাজের প্রবণতার যে উন্মেষ হয়, তাকে অংকুরে বিনষ্ট করা সম্ভব হয় আখেরাতের প্রতি সঠিক ও দৃঢ় বিশ্বাস মনে হর-হামেশা জাগ্রত থাকলে।

পার্থিব জীবনটাই একমাত্র জীবন নয়, বরঞ্চ মৃত্যুর পরের জীবনই আসল ও অনন্ত জীবন। সেখানে পার্থিব জীবনের নৈতিক পরিণাম ফল অবশ্য অবশ্যই প্রকাশিত হবে। সেখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষের গোপন প্রকাশ্য প্রতিটি কর্ম বিচারের জন্যে উপস্থাপিত করবেন। প্রতিটি পাপ পুণ্যের সুবিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেদিন করা হবে। সেদিনের ভয়াবহ রূপ যদি মনের কোণে চির জাগরুক থাকে, আর তার সাথে যদি থাকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান খোদার ভয়, তাহলেই পাপ কাজ থেকে দূরে সরে থেকে উন্নত ও মহান চরিত্র লাভ করা সম্ভব হবে। চরিত্র লাভের দ্বিতীয় বা বিকল্প কোন পন্থা নেই, থাকতেও পারে না।

দুনিয়ার কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে কিছুকাল নির্জন নীরব কারা জীবন-যাপন কালে 'মৃত্যু যবনিকার ওপারে' গ্রন্থখানি রচনা করেছি। এ গ্রন্থ রচনায় হঠাৎ প্রেরণা লাভ করেছিলাম তাফহীমুল কুরআনের সূরা 'কাফ'-এর তফসীর পড়তে গিয়ে। এতদ্ব্যতীত কোন জ্ঞানী গুণীর পরামর্শ নেয়ার অথবা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য নেয়ার সুযোগও তখন হয়নি। স্বভাবতঃই

গ্রন্থখানির মধ্যে কিছু অপূর্ণতা, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সহৃদয় পাঠকের মধ্যে কেউ এ বিষয়ে গ্রন্থকারকে অবহিত করলে অথবা অতিরিক্ত তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করলে কৃতজ্ঞতার সাথে তা পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংযোজিত করা হবে। তাছাড়া আগামী সংস্করণে অধিকতর বিস্তারিত আলোচনার আশা রইলো।

অবশ্যি এ বিষয়ের উপরে অনেকেরই লেখা বই বাজারে আছে। কিন্তু এ গ্রন্থ রচনাকালে হাতের কাছে কোন 'রেফারেন্স বুক্‌স' (অনুসরণযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ) না থাকলেও এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখার চেষ্টা করেছি। অবশ্যি বইয়ের ভাল-মন্দ হওয়াটা পাঠকেরই বিবেচ্য।

গ্রন্থ রচনার প্রায় দু' বছর পর তা প্রকাশিত হতে পারলো বলে এ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই অসীম অনুগ্রহ মনে করে তাঁর কাছে শুকরিয়ায় মাথা নত করছি।

এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করে এর আলোকে যদি কেউ তার জীবন খোদার মনোনীত পথে চালাবার চেষ্টা করেন, তাহলে আমার নীরব সংগীহীন দিনগুলোর শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাকেও তাঁর 'সিরাতুল মুস্তাকীমে' অবিরাম চলার শক্তি দান করেন, সে দোয়াই চাই মহান পাঠক-পাঠিকার কাছে। আমীন।

বিনীত

রবিউল আউয়াল ১৩৯৫ হিঃ
১৯৭৫ ইং

—গ্রন্থকার

اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہی
سامان سوبرس کاھیے پل کی خبر نہی

আগাহ্ আপনি মওত সে কুই বাশার নিহি.
সামান সও বরস্ কা হ্যায় পলকি খবর নিহি।

সজাগ সচেতন নয় সে মানুষ
ভয় নাহি তার মরণের।
মুহূর্তেরও খবর নাহি
স্বপ্ন রঙিন শত বরষের।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানব মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন

এ দুনিয়ার জীবনটাই কি একমাত্র জীবন, না এরপরও কোন জীবন আছে ? অর্থাৎ মরণের সাথে সাথেই কি মানব জীবনের পরিসমাপ্তি, না তার পরও জীবনের জের টানা হবে ? মানব মনের এ এক স্বাভাবিক প্রশ্ন এবং সকল যুগেই এ প্রশ্নে দ্বিমত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে দুই বিপরীতমুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

মানুষ ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছুকাল দুনিয়ায় অবস্থান করতঃ বিদায় গ্রহণ করে। এ অবস্থানকাল কারো কয়েক মুহূর্ত মাত্র। কারো বা কয়েক দিন, কয়েক মাস, কয়েক বছর। আবার কেউ শতাধিক বছরও বেঁচে থাকে। কেউ আবার অতি বার্ধক্যে শিশুর চেয়েও অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করে।

বেঁচে থাকাকালীন মানুষের জীবনে কত আশা-আকাংখা, কত রঙিন স্বপ্ন। কারো জীবন ভরে উঠে অফুরন্ত সুখ স্বাচ্ছন্দে, লাভ করে জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করার সুযোগ-সুবিধে ও উপায়-উপকরণ। ধন-দৌলত, মান-সম্মান, যশ ও গৌরব—আরো কত কি। অবশেষে একদিন সবকিছু ফেলে, সকলকে কাঁদিয়ে তাকে চলে যেতে হয় দুনিয়া ছেড়ে। তার তাখ্‌তে-তাউস, বাদশাহী, পারিষদবৃন্দ, উজির-নাজির, বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীবৃন্দ, অঢেল ধন-সম্পদ কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। পারে না কেউ বহু চেষ্টা তদবীর করেও। অতীতেও কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারেনি আর কেউ পারবেও না ভবিষ্যতে। রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, সাদা-কালো সবাইকেই স্বাদ গ্রহণ করতেই হয় মরণের।

কারো জীবনে নেমে আসে একটানা দুঃখ-দৈন্য। অপরের অবহেলা, অত্যাচার-উৎপীড়ন, অবিচার-নিষ্পেষণ। সারা জীবনভর তাকে এ সবকিছুই মুখ বুজে সয়ে যেতে হয়। অবশেষে সমাজের নির্মম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেও একদিন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

আবার এমনটিও দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি অতিশয় সৎ জীবনযাপন করছে। মিথ্যা, পরস্বাপহরণ, পরনিন্দা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা তার স্বভাবের বিপরীত। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বিপন্নের সাহায্য, ভাল কথা, ভাল কাজ ও ভাল চিন্তা তার গুণাবলীর অন্যতম।

কিন্তু সে তার জাতির কাছ থেকে পেল চরম অনাদর, অত্যাচার ও অবিচার। অবশেষে নির্মম নির্যাতনের মধ্যে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অথবা ফাঁসীর মঞ্চে তার জীবনলীলার অবসান হলো। এ জীবনে সে তার সত্য ও সুন্দরের কোন পুরস্কারই পেল না। তাহলে তার মানবতা শুধু আর্তনাদ করেই কি ব্যর্থ হবে ? আবার এ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় ভুরি ভুরি যে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সত্যের আওয়াজ তুলতে গিয়ে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করতে গিয়ে অসত্যের পূজারী জালেম শক্তিধরকে করেছে ক্ষিপ্ত, করেছে তাঁর ক্ষমতার মসনদকে কম্পিত ও টলটলয়মান। অতপর সে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে সত্যের পতাকাবাহীকে করেছে বন্দী। বন্দীশালায় তার উপরে চালিয়েছে নির্মম নির্যাতনের ষ্টীমরোলার, আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত করেছে তার দেহ। তথাপি তাকে বিচলিত করা যায়নি সত্যের পথ থেকে। তার অত্যাচার নির্যাতনের কথা যার কানেই গেছে তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছে। হয়তো সমবেদনায় দু' ফোঁটা চোখের পানিও গড়ে পড়েছে।

ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের অনুসারী যারা তারা কি চায় না যে, নির্যাতিত ব্যক্তি পুরস্কৃত হোক এবং জালেম স্বৈরচারীর শাস্তি হোক ? কিন্তু কখন এবং কিভাবে ?

আবার এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে অসংখ্য যে, এক ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে সুখে জীবন যাপন করছে। সে কারো সাথে অন্যায় করেনি কোনদিন। হঠাৎ একদিন একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত তার বাড়ী চড়াও করলো অন্যায়ভাবে। গৃহস্বামী ও তার পুত্রদেরকে তারা হত্যা করলো, নারীদের উপর করলো পাশবিক অত্যাচার। গৃহের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করলো। অবশিষ্টের উপর করলো অগ্নি সংযোগ। ঘটনাটি যেই শুনলো সেই বড়ো আক্ষেপ করলো। সকলের মুখে একই কথা ঃ আহ ! এমন নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ ? এর কি কোন বিচার নেই ?

হয়তো তার কোন বিচারের সম্ভাবনাও নেই। কারণ বিচারের ভার যাদের হাতে তাদের হয়তো সংযোগ সহযোগিতা রয়েছে উক্ত নরপিশাচদের সাথে। তাহলে কি মানব সন্তানের উপর এমনি অবাধ অবিচার চলতেই থাকবে ? বিচার হবার আগেইত উক্ত নির্যাতিত মানব সন্তানদের প্রাণবায়ু নির্বাপিত হয়েছে। এখন তারা কোথায় ? নির্যাতিত আত্মাগুলো কি মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে ? নিঃশেষ হয়ে গেছে না এখনো তারা আর্তনাদ করেই ফিরছে ? তাদের মৃত্যুর পরের অধ্যায়টা কেমন ? পরিপূর্ণ শূন্যতা, না অন্য কিছু ?

আর জালেম নরপিশাচ যারা, যাদের কোন বিচার হলো না এ দুনিয়ায়, তারাওত মরণ বরণ করবে। মৃত্যুর পরেও কি তাদের কিছু হবে না ? কোন শাস্তির ব্যবস্থা কি থাকবে না ?

আবার দেখুন, এ দুনিয়ার বুকে কাউকে তার অপরাধের শাস্তি এবং মহৎ কাজের পুরস্কার দিতে চাইলেই কি তা ঠিকমতো দেয়া যায় ?

মনে করুন, এক ব্যক্তি শতাধিক মানব সন্তানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার অত্যাচারে শত শত পরিবার ধ্বংস হয়েছে। অবশেষে তাকে একদিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। এখানে পৌঁছে সে আইনের চোরাপথে অথবা অন্য পন্থায় বেঁচেও যেতে পারে। তার বাঁচার কোন পথই না থাকলে আপনি তাকে শাস্তিই দেবেন। কি শাস্তি ? সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। প্রকৃত খুনীর মৃত্যুদণ্ড কিন্তু মওকুফও হয়ে যায়। সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি উক্ত খুনীকে তার নিজের স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে মুক্তও করে দিতে পারে। আর যদি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরই হয়, তাহলে শতাধিক ব্যক্তির হত্যার দায়ে কি একটি মাত্র মৃত্যুদণ্ড ? এ দণ্ড কি তার যথেষ্ট হবে ? কিন্তু এর বেশীকিছু করার শক্তিও যে আপনার নেই।

অপর দিকে এক ব্যক্তি তার সারা জীবনের চেষ্টা-সাধনায়, অক্লান্ত শ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষায় একটা গোটা জাতিকে মানুষের গোলামির নাগ-পাশ থেকে মুক্ত করে এক সর্বশক্তিমান সত্তার সুবিচারপূর্ণ আইনের অধীন করে দিল। তাদের জন্যে একটা সুন্দর ও সুখকর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দিল। তারা হলো সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত। তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু হলো সম্পূর্ণ নিরাপদ। এমন মহান ব্যক্তিকে কি যথাযোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করা যায় ?

উপরোক্ত ব্যক্তিদের জীবনের জের যদি মৃত্যুর পরেও টানা হয় এবং কোন এক সর্বশক্তিমান সত্তা যদি তাদের উভয় শ্রেণীকে যথাযোগ্য দণ্ডে দণ্ডিত ও পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন—যাদের যেমনটি প্রাপ্য—তাহলে কি সত্যিকার ন্যায় বিচার হয় না ? তাহলে বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখুন, মৃত্যুর পরের জীবনটাও কি অপরিহার্য নয় ?

এটাই সেই স্বাভাবিক প্রশ্ন যা আবহমানকাল থেকে মানব মনকে বিব্রত ও বিচলিত করে এসেছে।

এর সঠিক জবাব মানুষ চিন্তা-গবেষণা করে খুঁজে পায় না, পেতে পারে না। এর সঠিক জবাব পেতে হবে এক সর্বজ্ঞ ও নির্ভুল সত্তার কাছ থেকে। এ গ্রন্থখানি সে প্রশ্নেরই সঠিক জবাব।

পরকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

উপরে বর্ণিত মানব মনের স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব তালাশ করতে গিয়ে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে প্রাচীনকাল থেকে।

এ প্রশ্নের সাথে আর একটা প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেটা হচ্ছে এ জীবন-মরণের কোন মালিক, কোন নিয়ন্তা আছে, না নেই ? এ জগত ও অসংখ্য সৃষ্টি নিচয়, আকাশমণ্ডলী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্ররাজী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী প্রভৃতি এ সবেরও কি কোন স্রষ্টা আছে, না নেই ? এসব প্রশ্নের জবাব একই সাথে পাওয়া যায়।

১। একটা মতবাদ হলো—স্রষ্টা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এ জগত, আকাশ, মানুষ, জীবজন্তু এবং আরও যত সৃষ্টি—সবই হয়েছে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার ফলশ্রুতি স্বরূপ। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু সেই দুর্ঘটনারই ফল। পরকাল বলে কোন জিনিস নেই। মানবজাতিসহ যা কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে তার পুনর্বার অস্তিত্ব লাভ করার কোনই সম্ভাবনা নেই। এ জগতটা এক সময়ে অবশ্যি ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর আর কিছু থাকবে না।

২। কেউ বলে যে, এ জগত অনাদি ও অনন্ত। এর কোন ধ্বংস নেই। শুধু জীবকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু পুনর্জীবন লাভ সম্ভব নয়।

৩। কেউ আবার পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। তার অর্থ হলো—মানুষ তার ভাল অথবা মন্দ কৃতকর্ম ভোগ করার জন্যে মৃত্যুর পর বার বার এ দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে।*

৪। আবার কারো মত এই যে, মৃত্যুর পর মানুষের জন্যে দোযখ বেহেশত বা নরক ও স্বর্গ আছে। তবে পাপী নরকে শাস্তি ভোগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে ইহলৌকিক জীবনেও লাঞ্ছিত জীবনযাপন করার জন্যে। এখানেও প্রশ্ন রয়ে যায়। তাহলে কি পাপীর জন্যে নরকের শাস্তিই যথেষ্ট নয় ?

৫। কারো মতবাদ এই যে, এ জগতটা মহাপাপের স্থান। এখানে জীবনটাই এক মহাশাস্তি। যতোকাল পর্যন্ত এ পাপপূর্ণ জড়জগতের সংগে মানবাত্মার সংযোগ সম্পর্ক থাকবে, ততোকাল তাকে মৃত্যুর পর পুনঃপুনঃ

---

* যারা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী, তাদের এ মতবাদ সঠিক হলে মৃত্যুর পর যারা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে তাদের মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায়ের কিছু জ্ঞান থাকার কথা। কিন্তু কেউ কি বলেছে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার কথা ? পুনর্জন্মলাভ করার পর পূর্ববর্তী পার্থিব জীবনের জ্ঞান থাকাও অতি আবশ্যক। নতুবা পরবর্তী জন্ম যে পূর্ববর্তী জন্মেরই পরিণাম ফল তা কি করে জানা যাবে ? আর তা যদি জানাই না গেল, তাহলে পুনর্জন্মের পুরস্কার অথবা শাস্তি কিভাবে অনুভূত হবে ? —গ্রন্থকার

জন্মগ্রহণ করে এখানে ফিরে আসতে হবে। মানবাত্মার প্রকৃত মুক্তি (মহানির্বাণ (Emancipation of soul) বা তার ধ্বংসে। আর তা হতে পারে এভাবে যে প্রতি জন্মে মানুষকে কিছু পুণ্য অর্জন করতে হবে। অতপর তার কয়েক জন্মের পুণ্য একত্র করলে তার পরিমাণ যদি উল্লেখযোগ্য হয় ; তাহলে তখনই তার 'ফানা' বা ধ্বংস হবে। এটাই হলো তার পাপপূর্ণ জগত থেকে মুক্তি বা মহানির্বাণ।

এখানেও পাপ-পুণ্যের কোন স্থায়ী শাস্তি বা পুরস্কার নেই।

৬। পরকাল, বেহেশত ও দোযখে বিশ্বাসী অন্য একটা দলও আছে। তাদের কথা এই যে, তারা এমন এক বংশের উত্তরাধিকারী যা ছিল খোদার অতীব প্রিয় ও মনোনীত। অতএব পরকালে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। পাপের জন্যে তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হলেও কিছুক্ষণের জন্যে। তাদের বংশমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে খোদা তাদেরকে অতি সত্বরই বেহেশতে প্রমোশন দেবেন।

৭। পরকাল, দোযখ ও বেহেশতে বিশ্বাসী আর একটি দল আছে। তাদের কথা এই যে, খোদা তাঁর একমাত্র পুত্রকে (?) শূলবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। তারই বিনিময়ে তিনি সমগ্র মানবজাতির সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর এ পুত্রের উপর ঈমান এনে তাঁর কিছু গুণগান করলেই পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে।

৮। আবার কেউ পরকাল, দোযখ ও বেহেশতে বিশ্বাসী বটে। কিন্তু তারা আবার এ দুনিয়াতেই কিছু লোককে (মৃত অথবা জীবিত) বিশেষ গুণসম্পন্ন ও অতি শক্তিশালী বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস পরকালে এ লোকগুলো খোদার কাছে তাদের প্রভাব বিস্তার করে তাদের মুক্তি এনে দেবে। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তারা খোদাকে বাদ দিয়ে এসব তথাকথিত ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী লোকদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। এরা মৃত হলে তাদের কবরে ফুল, শিরনী, নযর-নিয়ায, মানত এবং এমনকি কবরকে সেজদাও করা হয়। আর জীবিত হলে তাদেরকে নানান মূল্যবান উপঢৌকন বা নযর-নিয়ায দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়।

উপরে পরকাল সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করা হলো। প্রশ্ন হচ্ছে—উপরোক্ত মতবাদগুলোর সত্যতার প্রমাণ কি ? এসব মতবাদ কি নির্ভুল ও সুষ্ঠু জ্ঞানভিত্তিক, না নেহায়েৎ আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতেই এসব গড়ে তোলা হয়েছে ? অথবা বংশানুক্রমে চলে আসা এক অন্ধ কুসংস্কারের মায়াজাল ? অথবা ধর্মের নাম করে পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন সুচতুর স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অর্থ লুটের প্রতারণার জাল ?

যদি তা কাল্পনিক ও আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক হয়, অথবা অন্ধ কুসংস্কার অথবা ধর্মীয় গুরুর লেবাস পরিহিত অর্থলোলুপ ব্যক্তির প্রতারণার জাল হয়, তাহলে তা যে কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা সকলেই স্বীকার করবেন। যদি তা জ্ঞান ভিত্তিক হয়, তাহলে সে জ্ঞানের উৎসই বা কি ? তাই নির্ভুল জ্ঞানের কষ্টিপাথরেই বিষয়টি যাঁচাই করে দেখতে হবে বৈ কি ?

প্রকৃত জ্ঞানের উৎস

এখন প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কি তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। জ্ঞানের উৎস প্রধানত ঃ

১। পঞ্চেন্দ্রিয়–(ইন্দ্রিয় ভিত্তিক ও ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান)

২। অহী–(খোদার পক্ষ থেকে নবীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত অভ্রান্ত নির্ভুল জ্ঞান)।

জ্ঞানের সূত্র মাত্র উপরের দু'টি। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের (Experiment & Observation) দ্বারা এ জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তার মূলেও রয়েছে ইন্দ্রিয়নিচয় ও কিছু মৌলিক বস্তু সমষ্টি (Basic Materials)।

সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারাও জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু সে জ্ঞান সাক্ষ্যদাতার ইন্দ্রিয়লব্ধ। তেমনি ইতিহাস পাঠে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাও ইতিহাস লেখকের চোখে দেখা অথবা কানে শুনা জ্ঞান। তার অর্থ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। এ জ্ঞানও সবসময়ে নির্ভুল হয় না। সত্যের বিপরীত সাক্ষ্যও দেয়া হয়ে থাকে এবং সত্যকে বিকৃত করেও ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে। তথাপি সত্য-মিথ্যা জ্ঞানের উৎসই এগুলোকে বলতে হবে।

এখন পরকাল সম্পর্কে যে জ্ঞান, অর্থাৎ পরকাল আছে বলে যে জ্ঞান, অথবা পরকাল নেই বলে যে জ্ঞান, তার কোনটাই ইন্দ্রিয়লব্ধ হতে পারে না। কারণ মৃত্যু যবনিকার ওপারে গিয়ে দেখে আসার সুযোগ কারো হয়নি অথবা মৃতাত্মার সাথে সংযোগ (Contact) রক্ষা করারও কোন উপায় নেই, যার ফলে কেউ একথা বলতে পারে না যে, পরকাল আছে অথবা নেই।

কেউ কেউ বিজ্ঞানীর মতো ভান করে বলেন যে, পরকাল আছে তা যখন কেউ দেখেনি, তখন কিছুতেই তা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তাঁর এ উক্তি মোটেই বিজ্ঞানসুলভ ও বিজ্ঞোচিত নয়। কারণ কেউ যখন মৃত্যুর পরপারে গিয়ে সেখানকার হাল-হকিকত দেখে আসেনি, তখন কি করে একথা বলা যায় যে, পরকাল নেই ?

আমার বাক্সটিতে কি আছে, কি নেই, তা আপনি বাক্সটি খুলে দেখেই বলতে পারেন। কিন্তু বাক্সটি না খুলেই কি করে আপনি বলতে পারেন, বাক্সটিতে কিছু নেই, আপনি শুধু এতটুকু আলবৎ বলতে পারেন, বাক্সটিতে কিছু আছে কি নেই তা আমার জানা নেই।

একজন প্রকৃত বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ দ্বারা (অবশ্যি তা অনেক সময় ভুলও হয়) কোন কিছুর সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারেন। কিন্তু তার সে

পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে হাঁ বা না কিছুই বলতে পারেন না। তাঁকে একথাই বলতে হয়—এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। অতএব সত্যিকার বৈজ্ঞানিকের উক্তি হবে—পরকাল আছে কি নেই—তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অতএব আছে বললে যেমন ভুল হবে, ঠিক তেমনি নেই বললেও ভুল হবে।

উপরের আলোচনা দ্বারা জানা গেল, জ্ঞানের প্রথম উৎস পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরকাল সম্পর্কে আমাদেরকে কোনই ধারণা দিতে পারলো না। এখন রইলো দ্বিতীয় সূত্র অহী। দেখা যাক অহী আমাদের কি জ্ঞান দান করে।

যুগে যুগে নবীর আগমন

অহীর প্রতি বিশ্বাস খোদার প্রতি বিশ্বাস থেকেই হতে পারে। উপরে পরকাল সম্পর্কে যেখানে বিভিন্ন মতবাদ পেশ করা হয়েছে, সেখানে ১নং ২নং এবং ৫নং-এ বর্ণিত মতবাদে বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অন্য সকল মতবাদীগণ মোটামুটিভাবে একজন স্রষ্টা বা খোদায় বিশ্বাসী। আবার খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়েও অনেকে পরকাল অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু যারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তারা স্বভাবতই পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী। এ আলোচনা পরকাল সম্পর্কে—খোদার অস্তিত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে নয়। তবুও পরকালের আলোচনা দ্বারা খোদার শুধু অস্তিত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যাবে না, বরঞ্চ তাঁর একত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, এমন কি ভূগর্ভ ও সমুদ্রগর্ভে যা কিছু আছে, সবেরই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। মানুষ সৃষ্টি করার পর তাদের সঠিক জীবনবিধান সম্পর্কে তাদেরকে জানাবার জন্যে তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের জাতির মধ্যে নবী পাঠিয়েছেন। বলা বাহুল্য নবীগণ মানুষই ছিলেন। তবে আল্লাহ তায়ালা সমাজের উৎকৃষ্টতম মানুষকেই নবী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। নবীর কাছে আল্লাহ যে জ্ঞান প্রেরণ করেন তাকে বলা হয় অহীর জ্ঞান। এ জ্ঞান নবী সরাসরি খোদার কাছ থেকে লাভ করেন, অথবা ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) মাধ্যমে অথবা স্বপ্নযোগে। এ জ্ঞান যেহেতু খোদার নিকট থেকে লাভ করা, তাই এ একেবারে অভ্রান্ত ও মোক্ষম সত্য।

এ দুনিয়াতে প্রথম নবী ছিলেন স্বয়ং আদি মানব হযরত আদম (আ)। সর্বশেষ নবী আরবের হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)। সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অথবা মতান্তরে আরও বেশী বা কম নবী এ দুনিয়ায় এসেছেন। কিছু সংখ্যক নবীর উল্লেখ কুরআনে আছে। আবার অনেকের উল্লেখ নেই। একথা কুরআনেই বলে দেয়া হয়েছে।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) এবং আর যত নবী, তাঁদের প্রত্যেকেই পরকাল সম্পর্কে একই প্রকার মতবাদ পেশ করেছেন। পরকাল সম্পর্কে নবীদের উক্তির মধ্যে সামান্যতম মতভেদও নেই। তাঁরা সকলে বলেছেন একই কথা।

মনে রাখতে হবে যে, এই লক্ষাধিক নবী একই যুগের এবং একই জনপদের লোক ছিলেন না যে, তাঁরা কোন একটি সম্মেলন করে বহু আলাপ-

আলোচনার পর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। একমাত্র হযরত নূহের (আ) মহাপ্লাবনের পর থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত প্রায় ছ' হাজার বছর ধরে বিভিন্ন জাতির কাছে নবী প্রেরিত হয়েছেন। হযরত আদম (আ) এবং হযরত নূহের (আ) মধ্যবর্তী সময়েও অনেক নবী এসেছেন।

সাধারণত একজন নবীর তিরোধানের পর তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ মানুষ একেবারে ভুলে বসলে আর এক নবী প্রেরিত হয়েছেন। হযরত ঈসার (আ) তিরোধানের ছ'শ বছর পর শেষ নবীর আবির্ভাব হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত এক নবীর সাথে অন্য নবীর সাক্ষাতও হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন যুগের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সকলে বলেছেন একই কথা। তার কারণ এই যে, তাঁরা মানুষের কাছে যে বাণী প্রচার করেছেন, তা ছিল না তাঁদের মনগড়া কথা। একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানই তাঁরা মানুষের মধ্যে পরিবেশন করেছেন। এ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান থেকেই তাঁরা পরকাল সম্পর্কে অভিন্ন মতবাদ পেশ করেছেন।

নির্ভুল উত্তর মাত্র একটি

একথা সর্ববাদিসম্মত যে নির্ভুল উত্তর শুধুমাত্র একটিই হয়ে থাকে। যা ভুল তা হয় বহু। যারা ভুল করে তাদের মধ্যে চিন্তার ঐক্য থাকে না। কোন নির্ভুল সূত্র থেকে তাদের চিন্তা প্রবাহিত হয় না। তাই আপনি একটি ক্লাসে বিশজন ছাত্রকে একটা অংক কষতে দিন। দেখবেন সঠিক উত্তর একই রকম হয়েছে। যারা উত্তর দিতে ভুল করেছে তারা একমত হতে পারেনি। তাদের উত্তর হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের। কারণ তাদের উত্তর হয়নি সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে।

পরকাল সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আল্লাহর নবীগণ। তাদের জবাব সঠিক এ জন্যে যে তাদের সকলের জবাব হুবহু একই হয়েছে। আর এর সঠিকতা ও সত্যতার কারণ ছিল এই যে, তাঁদের জ্ঞান ছিল খোদা প্রদত্ত।

অতএব পরকাল সম্পর্কে নবীদের যে জ্ঞান তা একদিকে যেমন ছিল মহাসত্য, অপরদিকে তা ছিল সকলেরই এক ও অভিন্ন।

পরকাল সম্পর্কে ইসলামী মতবাদ

পরকাল সম্পর্কে নবী প্রদত্ত যে ধারণা, যাকে বলে ইসলামী ধারণা বা মতবাদ, তাহলো সংক্ষেপে এই যে, পৃথিবী, আকাশমণ্ডলী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় সৃষ্টি একদিন অনিবার্যরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধ্বংসের সূচনা ও বর্ণনা কুরআনে দেয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে। একমাত্র খোদা ব্যতীত আর যত কিছু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতপর খোদারই নির্দেশে এক নতুন জগত তৈরী হবে। প্রতিটি মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে খোদার দরবারে উপস্থিত হবে। দুনিয়ার জীবনে সে ভালো মন্দ যা কিছুই করেছে, তার হিসাব-নিকাশ সে দিন তাকে দিতে হবে খোদার দরবারে। এটাকে বলা হয়েছে—বিচার দিবস। এ দিবসের একচ্ছত্র মালিক ও বিচারক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

এ বিচারকালে আসামী পক্ষ সমর্থনে থাকবে না কোন উকিল-মোক্তার, এডভোকেট—ব্যারিষ্টার। কোন মানুষ সাক্ষীরও প্রয়োজন হবে না। দোষ অস্বীকার করলে শরীরের অংগ-প্রত্যংগই সঠিক সাক্ষ্য দেবে। দোষ স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ মানুষের প্রতিটি মুহূর্তের কাজ-কর্ম নিখুঁতভাবে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে এ দুনিয়ার জীবনেই। কথা-বার্তা, হাসি-কান্না, অংগ-প্রত্যংগ চালনা, এমন কি গোপন ও প্রকাশ্য প্রতিটি কাজেরই অবিকল ফিলম্ তৈরী হচ্ছে। এ মূর্তিমান সাক্ষ্য প্রমাণই তার সামনে রাখা হবে। কোন কিছু অস্বীকার করার উপায়টি নেই।

সে দিনের বিচারে কেউ উত্তীর্ণ হলে, তার বাসস্থান হবে বেহেশ্ত। এ এক অফুরন্ত সুখের স্থান। যারা সেদিনের বিচারে হবে অকৃতকার্য, তাদের স্থান হবে জাহান্নাম বা দোযখে। সে এক অনন্তকাল ব্যাপী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। মানুষ বেহেশ্তেই যাক অথবা জাহান্নামে, তার জীবন ও আয়ু হবে অনন্ত। মানুষ লাভ করবে এক অমর জীবন। এ জীবনকালকেই বলা হয় পরকাল, কুরআনের পরিভাষায় যাকে বলে 'আখেরাত'।

পরকালের বিরোধিতা

প্রত্যেক যুগেই অজ্ঞ মানুষেরা পরকালের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি যে, মৃত্যুর পর মানুষ আবার পুনর্জীবন লাভ করবে। একজন সৃষ্টিকর্তায় তাদের বিশ্বাস থাকলেও তাঁর গুণাবলী ও পরিচয় সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট। তাই পরকাল তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি।

মৃত্যুর পর মানুষের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ, অস্থি, চর্ম, মাংস, প্রতিটি অণু-পরমাণু, ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। অথবা মৃত্তিকা এ সবকিছুই ভক্ষণ করে। অতপর তা আবার কি করে পূর্বের ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ ও জীবন লাভ করবে ? এ ছিল তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। তার জন্যে প্রত্যেক নবী পরকালের কথা বলে যখন মানুষের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন, তখন জ্ঞানহীন লোকেরা তাঁকে পাগল বলে অভিহিত করেছে। তাঁর মতবাদ শুধু মানতেই তারা অস্বীকার করেনি, বরঞ্চ সে মতবাদ প্রচারের অপরাধে তাঁকে নির্যাতিত করেছে নানানভাবে।

পরকাল বিরোধিতা কেন ?

পরকালের প্রতি বিশ্বাস এত মারাত্মক ছিল কেন ? এ মতবাদের প্রচার বিরুদ্ধবাদীদেরকে এতটা ক্ষেপিয়ে তুলেছিল কেন ? এ প্রচারের ফলে তাদের কোন্ সর্বনাশটা হচ্ছিল যার জন্যে তারা তা বরদাশ্‌ত করতে পারেনি ?

এর পশ্চাতে ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক কারণ। তাহলো এই যে, যারা পরকালে বিশ্বাসী, তাদের চরিত্র, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ রুচি ও মননশীলতা, সভ্যতা সংস্কৃতি হয় এক ধরনের। পক্ষান্তরে পরকাল অবিশ্বাসীদের এসব কিছুই হয় সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। এ এক পরীক্ষিত সত্য।

পরকাল বিশ্বাসীদের এমন এক মানসিকতা গড়ে ওঠে যে, সে প্রতি মুহূর্তে মনে করে তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কাজের জন্যে তাকে মৃত্যুর পর খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তার প্রতিটি কথা ও কাজ নির্ভুলভাবে এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা লিপিবদ্ধ হচ্ছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। তার কোন একটি গোপন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার প্রতিটি মন্দ কাজের জন্যে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। এ হচ্ছে তার দৃঢ় প্রত্যয়। তাই সে বিরত থাকার চেষ্টা করে সকল মন্দ কাজ থেকে।

ঠিক এর বিপরীত চরিত্র হয় পরকাল অবিশ্বাসীদের। যেহেতু তাদের ধারণা বা বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই, তাই তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। দুনিয়ার জীবনে তারা যদি চরম লাম্পট্য ও যৌন অনাচার (Sexual anarchy) করে, তারা যদি হয় দস্যু ও লুণ্ঠনকারী, তারা যদি মানুষকে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে পশুর চেয়ে হীন জীবনযাপন করতে বাধ্য করে, তবুও তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই। কারণ তাদের বিশ্বাস এসবের জন্যে তো তাদেরকে মৃত্যুর পর কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। তাদের মতে মৃত্যুর পরে তো আর কিছুই নেই। না নতুন জীবন, আর না হিসাব-নিকাশের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা।

একজন সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল অস্বীকার করে এক নতুন মতবাদ গড়ে তোলা হয়েছে। সেটা হলো এই যে, যেহেতু সৃষ্টি জগতের কোন স্রষ্টাও নেই, পরকাল বলেও কিছু নেই, অতএব জীবন থাকতে এ দুনিয়াকে প্রাণভরে উপভোগ করতে হবে। কারণ মৃত্যুর পরত সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। অতএব খাও দাও আর জীবনকে উপভোগ কর—(Eat, Drink and Be Merry) আরও বলা হয় যে, এ দুনিয়ার জীবনটা হলো একমাত্র বেঁচে থাকার সংগ্রাম (A struggle for existence)। যে সবল, ধূর্ত ও বুদ্ধিমান তারই একমাত্র বেঁচে থাকার অধিকার আছে (Survival of the fittest)। আর যে দুর্বল, হোক সে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

স্রষ্টা ও পরকাল স্বীকার করলেই প্রবৃত্তির মুখে লাগাম লাগাতে হবে, স্বেচ্ছারিতা ও উচ্ছৃংখলতা বন্ধ করতে হবে এবং অন্যায় ও অসদুপায়ে জীবনকে উপভোগ করা যাবে না। উপরন্তু জীবনকে করতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল। আর তা করলে তো জীবনটাকে কানায় কানায় ভোগ করা যাবে না। অতএব খোদা ও পরকালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার পিছনে তাদের এই ছিল মনস্তাত্বিক কারণ।

উপরের দৃষ্টিভংগী ও মানসিকতা তৈরী হয় পরকাল অবিশ্বাস করার দরুন। নৈতিকতা, ন্যায়, সুবিচার, দুর্বল ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন প্রভৃতি গুণাবলীতে তারা বিশ্বাসী নয়। নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, হত্যাকাণ্ড, প্রতিশ্রুতি ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা তাদের কাছে কোন অপরাধ বলে স্বীকৃত নয়। যৌন বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে নারীজাতিকে ভোগ লালসার সামগ্রীতে পরিণত করতে, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একটি মানবসন্তান কেন একটা গোটা দেশ ও জাতিকে গোলামে পরিণত করতে অথবা ধ্বংস করতে তাদের বিবেক কোন দংশন অনুভব করে না। তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অতীতের বহু জাতি পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করলেও পরকাল অবিশ্বাস করার কারণে তারা নিমজ্জিত হয়েছিল নৈতিক অধঃপতনের অতল তলে। তারা হয়ে পড়েছিল চরম অত্যাচারী রক্ত পিপাসু নরপিশাচ। তাই আল্লাহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছেন এবং তাদের নাম নিশানা মিটিয়ে দিয়েছেন দুনিয়ার বুক থেকে।

এটাই ছিল আসল কারণ, যার জন্যে কোন নবী পরকালের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের আবেদন জানালে পরকালে অবিশ্বাসী লোকেরা তাঁকে করেছে অপদস্ত, প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত অথবা করেছে মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত। পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে তারা তাদের জীবন ধারাকে করতে চায়নি সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত, তাদের উদগ্র ভোগলিপ্সাকে করতে চায়নি দমিত। মানুষকে গোলাম

বানিয়ে তাদের উপর খোদায়ী করার আকাংখাকে করতে চায়নি নিবৃত্ত। নবীদের সাথে তাদের বিরোধের মূল কারণই ছিল তাই।

পরকালে অবিশ্বাস ও চরম নৈতিক অধঃপতনের কারণে অতীতে হযরত নূহের (আ) জাতি, লূতের (আ) জাতি, নমরূদ, ফেরাউন, আদ ও সামুদ জাতি, তুব্বা প্রভৃতি জাতিসমূহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। মানব সমাজে তাদের নাম উচ্চারিত হয় ঘৃণা ও অভিশাপের সাথে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতাও শুধুমাত্র অতীত ইতিহাসের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

একমাত্র খোদাভীতি অপরাধ প্রবণতা দমন করে

অপরাধ দমনের জন্যে প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয়। অবশ্যি এর প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শুধু মাত্র দণ্ডবিধি প্রণয়ন ও অপরাধীর প্রতি দণ্ড প্রদানের দ্বারাই কি অপরাধ প্রবণতা দমন করা যায়?

দেশে আইন ও দণ্ডবিধি থাকা সত্ত্বেও হত্যা, লুট, রাহাজানি, ব্যভিচার, দুর্নীতি, হানাহানি ও অন্যান্য জঘন্য ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয় কেন? এ সবের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।

অপরাধ প্রবণ ব্যক্তি সাধারণত লোক চক্ষুর অন্তরালে অতি সংগোপনে তার কুকার্য সম্পাদন করে। এরপরে আইনকে ফাঁকি দেয়ার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। সে জন্যে দেখা যায়, অপরাধীর জন্যে আইনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অপরাধী নির্বিঘ্নে মুক্তি পেয়ে যায়। অপরাধ করার পর মুক্তিলাভ তাকে অপরাধ করার জন্যে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ উৎসাহিত করে। আমাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থা মানব রচিত হওয়ার কারণে ত্রুটিপূর্ণ। আইন ব্যবসায়েও সততার অভাব আছে। উপরন্তু অনেক সময় বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে অথবা দণ্ড প্রাপ্তির পরও বিশেষ মহলের প্রভাবে অপরাধী শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়। ফলে মযলুম নিপীড়িত অসহায় মানুষ সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়। সে জন্যে দেখা যায় প্রকৃত হত্যাকারী, লক্ষ কোটি টাকা লুণ্ঠন ও আত্মসাতকারী ও নানাবিধ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি নানান অসাধু উপায়ে আইনকে ফাঁকি দিয়ে বুক ফুলিয়ে সমাজে বিচরণ করে।

অপরাধীর শাস্তিই শুধু কারো কাম্য হওয়া উচিত নয়, অপরাধের মূলোৎপাটনই কাম্য হওয়া উচিত। তা কিভাবে সম্ভব?

অপরাধ প্রবণতা সর্বপ্রথম জন্মলাভ করে মনের গোপন কোণে। চারদিকের পাপপূর্ণ পরিবেশ, পাপাচারীদের সাহচর্য, অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য ও নাটক

উপন্যাস পাঠ, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ছায়াছবি ও টেলিভিশন অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। অতপর অপরাধ সংঘটিত করার কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ও সংকল্প মানুষকে অপরাধে লিপ্ত করে। এখন প্রয়োজন মনের মধ্যেই এ প্রবণতাকে অংকুরে বিনষ্ট করা। কিন্তু তা কোন আইন করে, ভীতি প্রদর্শন করে অথবা কোন বহিঃশক্তির দ্বারা বিনষ্ট করা কিছুতেই সম্ভব নয়। মনের অভ্যন্তরেই এমন এক শক্তি সঞ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—যা অপরাধ প্রবণতা দমন করতে সক্ষম। একমাত্র খোদা ও পরকালভীতিই সে শক্তির উৎস হতে পারে। মানুষের মধ্যে যদি এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন নয়—বরঞ্চ মৃত্যুর পরেও এক জীবন রয়েছে—যার কোন শেষ নেই এবং দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের উপরই পরকালীন জীবন নির্ভরশীল। এ জীবনে মানুষ যা কিছু করে গোপনে এবং প্রকাশ্যে তার প্রতিটির পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে পরকালে আল্লাহ তায়ালার দরবারে, এ জীবনের পাপ ও পুণ্য কোনটাই গোপন করা যাবে না, পাপের শাস্তি থেকে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না এবং পুণ্যের পুরস্কার থেকেও কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তাহলে মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি এবং তদনুযায়ী মানসিক প্রশিক্ষণ ও বাস্তব চরিত্র গঠন সকল প্রকার পাপাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করে।

অতএব খোদা ও পরকাল ভীতিই মানুষকে পাপাচার থেকে দূরে রাখতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে এর স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটা উল্লেখ এখানে করছি।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের (রা) যুগে মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতো এক বৃদ্ধা। সংসারে সে এবং তার কন্যা। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করার পর তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করতো।

একদা রাত্রিকালে বৃদ্ধা তার মেয়েকে বললো—দুধে কিছু পানি মিশিয়ে দে, বেশী দাম পাওয়া যাবে।

মেয়ে বললো—সে কি করে সম্ভব ? তুমি কি শুননি আমীরুল মুমেনীন দুর্নীতিকারীদের জন্যে শাস্তি ঘোষণা করেছেন ?

বৃদ্ধা—দূর ছাই। রাত্রি বেলা এ নিভৃত পল্লীতে কোথায় আমীরুল মুমেনীন, আর কোথায় তাঁর গুপ্ত পাহারাদার যে দেখে ফেলবে ?

মেয়ে—এটা ঠিক যে আমাদের এ দুষ্কর্ম কোন মানুষই দেখতে পাবে না। কিন্তু খোদার চক্ষুকে কি তুমি ফাঁকি দিতে পারবে মা ? রোজ কিয়ামতে যে আমরা ধরা পড়ে যাব।

বৃদ্ধা তার সম্বিৎ ফিরে পেল। খোদা এবং পরকালের ভীতি তাকে সন্ত্রস্ত করে তুললো। সে তওবা করে তার অপরাধ প্রবণতা দমন করলো।

খলিফা হযরত ওমর (রা) ছদ্মবেশে শহর পরিভ্রমণকালে ঘটনাক্রমে এ দু'টি নারীর কথোপকথন শুনতে পান। বালিকাটির খোদাভীতিতে প্রীত হয়ে তিনি তাকে তাঁর পুত্র বধু করে নিয়েছিলেন।

সমাজে এ ধরনের ঘটনা আজো হয়তো অহরহ ঘটছে। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় তার সংখ্যা অতি নগণ্য।

মানুষের চরিত্র যদি তৈরী হয় এমনি খোদা ও পরকালভীতির ভিত্তিতে তাহলে সমাজ থেকে অপরাধ ও দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্যে কোন প্রকাশ্য বাহিনী পোষণ করার প্রয়োজন হবে না। দুর্নীতি দমন বিভাগ বা বাহিনীর লোকের হৃদয়ে যদি খোদা ও পরকালের ভয় না থাকে, তাহলে তাদেরও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু হবে না। অতপর সে দেশে দুর্নীতি ও অপরাধ দমনের পরিবর্তে সকলে একত্রে মিলে তা পোষণ করাই হবে সবার কাজ।

পরকালে বিশ্বাস ও চরিত্র গঠন

সকল যুগে এবং সকল জাতির কাছে চরিত্র গঠন কথাটি বড়ই সমাদৃত। তাই চরিত্রবান লোককে সকল যুগেই শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে। সত্য কথা বলা, বৈধ উপায়ে জীবনযাপন করা, অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন, বিপন্নকে সাহায্য করা, অপরের জীবন, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আবরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করা, কর্মঠ ও সৎকর্মশীল হওয়া, আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও সহনশীলতা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি মহৎ চরিত্রের গুণাবলী হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত।

এখন প্রশ্ন হলো এই যে, এসব চারিত্রিক গুণাবলী কিভাবে অর্জন করা যায়। তা অর্জনের প্রেরণা কি করে লাভ করা যায় এবং সে প্রেরণার উৎসই বা কি হতে পারে।

অবশ্যি খোদা ও পরকাল বিশ্বাস না করেও উপরে উল্লেখিত গুণাবলীর কিছুটা যে অর্জন করা যায় না, তা নয়। তবে তা হবে আংশিক, অস্থায়ী, অপূর্ণ ও একদেশদর্শী (Partial)। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত গুণাবলী আংশিকভাবে অর্জন করা যেতে পারে শুধুমাত্র দেশ ও জাতির স্বার্থে। আবার দেশ ও জাতির স্বার্থেই উক্ত গুণাবলী পরিহার করাই মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হয়। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য দেশ ও জাতিকে পদানত করা, অন্য জাতির লোককে দাসে পরিণত করে তাদেরকে পশুর চেয়ে হেয় জীবনযাপন করতে বাধ্য করা মোটেই দূষণীয় মনে করা হয় না।

ইংরেজ জাতির দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হয় যে, তারা সমষ্টিগতভাবে খোদা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী না হয়েও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরশীল, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, মহানুভব ও মানবদরদী, মানবতার সেবায় তারা নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যক্তিগতভাবে তাদের কারো মধ্যে কিছু চারিত্রিক গুণ পাওয়া গেলেও গোটা জাতি মিলে তারা যাদেরকে তাদের জাতীয় প্রতিনিধি মনোনীত করে তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশ্যে মিথ্যা, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভংগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যায়, অবিচার, নর হত্যা প্রভৃতি ঘৃণ্য অপরাধগুলো নির্দ্বিধায় করে ফেলে। এরপরও সমগ্র জাতির তারা অভিনন্দন লাভ করে। ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের উপনিবেশগুলোর অধিবাসীদের সাথে যে আচরণ করেছে বর্বরতার চেয়ে তা কোন্ দিক দিয়ে কম? ইংরেজ জাতির প্রাতঃস্মরণীয় ও চিরস্মরণীয় নেতা ক্লাইভ্ পলাশীর আম্রকাননে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের জন্যে যে প্রতারণা ও বিশ্বাস-

ঘাতকতার ভূমিকা পালন করে তা ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন বিত্তহীন কেরানী ১৭৪৪ সালে ভারত আগমন করে। ১৭৬০ সালে যখন ঘরে ফিরে যায়, তখন তার কাছে নগদ টাকা ছিল প্রায় দু' কোটি। তার স্ত্রীর গয়নার বাক্সে মণি-মুক্তা ছিল দু' লাখ টাকার। তখন সে ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। এসব অর্থ-সম্পদ বিজিত রাজ্যের প্রজাদের থেকে অন্যায়ভাবে লুণ্ঠন করা সম্পদ। তাদের জীবন দর্শনে অপরের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা নৈতিকতা বিরোধী নয়। ডালহৌসী, ওয়ারেন হেষ্টিংসের অন্যায়-অবিচার ও নিষ্ঠুর আচরণ কি কোন কাল্পনিক ঘটনা ? বর্তমান জগতের সভ্যতার ও মানবাধিকার প্রবক্তা আমেরিকানগণ কোন্ মহান চরিত্রের অধিকারী ? আপন স্বার্থে লক্ষ কোটি মানব সন্তানকে পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে নির্মূল করতে তারা দ্বিধাবোধ করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈল নামে একটি ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তন করে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি নষ্ট করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এর জন্যে আমেরিকাবাসী কি দায়ী নয় ? এটা কি মানবদরদী চরিত্রের নিদর্শন ?

কমিউনিজম-সোশ্যালিজমে তো নীতি-নৈতিকতার কোন স্থানই নেই। খোদা ও আখেরাতে অবিশ্বাসী হিটলার, লেলিন, ষ্টালিন প্রমুখ রাষ্ট্রনায়ক কোটি কোটি মানুষের রক্ত স্রোত প্রবাহিত করে কোন্ চরিত্রের অধিকারী ছিল ? চীনেও আমরা একই দৃশ্য দেখি।

আখেরাতকে অবিশ্বাস করে যে সত্যিকার চরিত্রবান হওয়া যায় না সে সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা নিম্নরূপ ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝ أُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ۝

"আসল ব্যাপার এই যে, যারা আমাদের সাথে (আখেরাতে) মিলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পায় না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমাদের নিদর্শনগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে, তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম—ঐসব কৃতকাজের বিনিময়ে যা তারা (তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতির দ্বারা) করেছে।"

—(সূরা ইউনুস ঃ ৭-৮)

আখেরাত অবিশ্বাস করার পরেও চরিত্রবান হয়ে সৎকর্ম করতে পারলে তার বিনিময়ে বেহেশতের পুরস্কারের পরিবর্তে জাহান্নাম তাদের শেষ আশ্রয়স্থল কেন হবে ? অবশ্য আংশিক কিছু চারিত্রিক গুণ লাভ করা যেতে পারে শুধু মাত্র উপযোগবাদের (UTILITARIANISM—যাহা জনহিতকর তাহাই ন্যায়সংগত এই মতবাদ) ভিত্তিতে। এই চারিত্রিক গুণ ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতএব জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার স্বার্থে চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে হলে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের উর্ধে এক অসীম শক্তিমানের নিরংকুশ আনুগত্য স্বীকার করা ব্যতীত উপায় থাকে না।

উপরন্তু ভালো-মন্দ চরিত্র নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি বা মাপকাটি হওয়াও বাঞ্ছনীয়। দেশ ও জাতি মানুষের জন্যে না কোন সঠিক জীবন বিধান দিতে পারে, আর না ভালো-মন্দের কোন মাপকাঠি নির্ণয় করে দিতে পারে। কাল, অবস্থা ও জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষিতে ভালো-মন্দ নির্ণীত হয়। আজ যা ভালো বলে বিবেচিত হয়, কাল তা হয়ে পড়ে মন্দ। তাই দেখা যায় কোন কোন দেশের আইন সভায় একবার মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তীকালে তা আবার বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। জাতীয়তাবাদী দেশগুলোতে আপন জাতির নাগরিকদেরকে যে মর্যাদায় ভূষিত করা হয়, অন্য জাতির লোক সে মর্যাদা থেকে হয় সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। আইনের চোখেও আপন জাতীয় লোক এবং বিজাতীয়রা সমান ব্যবহার পায় না।

এ জন্যেই খোদা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। খোদা মানুষের জন্যে একটা সুন্দর, সুষ্ঠু ও পূর্ণাংগ জীবন বিধান দিয়েছেন, ভালো-মন্দ ঘোষণা করেছেন এবং ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ের জন্যে একটা চিরশাশ্বত নিয়ম-নীতি নির্ধারিত করে দিয়েছেন। বন্ধু ও শত্রুর জন্যে একই ধরনের আইন ও আচরণ পদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছেন। এসব নিয়ম-পদ্ধতি থাকবে অটল ও অপরিবর্তনীয়।

ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় নির্ধারিত করে দেয়ার পর আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের ভিত্তিতেই মানুষের বিচার হবে পরকালে। ভালো চরিত্রের লোক সেখানে হবে পুরস্কৃত এবং লাভ করবে চিরন্তন সুখী জীবন। পক্ষান্তরে মন্দ চরিত্রের লোকের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এ এক অনিবার্য সত্য যা অস্বীকার করার কোন ন্যায়সংগত কারণ নেই।

এখন খোদা ও পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতেই ভালো চরিত্র লাভ করে ভালোভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব। কারণ ভালো চরিত্র গঠনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা একমাত্র পরকাল বিশ্বাসের দ্বারাই লাভ করা যেতে পারে। এ বিশ্বাস

মনের মধ্যে যতদিন জাগরুক থাকবে, ততোদিন ভালো কাজ করা ও ভালো পথে চলার প্রেরণা লাভ করা যাবে।

মানব জাতির ইতিহাসও একথারই সাক্ষ্য দেয় যে, যখন মানুষ ও কোন জাতি খোদা ও আখেরাতকে অস্বীকার করেছে, অথবা ভুলে গিয়েছে, তখনই তারা চারিত্রিক অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে। তাদের কৃত অনাচার-অবিচারে সমাজ জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার, আর্তনাদ। অবশেষে সে জাতি হয়েছে নিস্তনাবুদ এবং মুছে গেছে দুনিয়া থেকে তাদের নাম নিশানা।

এখন দেখা যাক আখেরাত সম্পর্কে কুরআন পাকে কি অকাট্য যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। আখেরাতের বিশ্বাস এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, এর প্রতি অবিশ্বাস স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর নবী-রসূলগণের প্রতি অবিশ্বাসেরই নামান্তর। তৌহিদ ও রিসালাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাথে আখেরাতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হলেই নবী-রসূলগণ কর্তৃক প্রদর্শিত ইসলামী জীবন দর্শন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রাসাদ সুরক্ষিত হবে। আর আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসের কারণেই এ প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لا لَايَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ط بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ○ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"অবিশ্বাসীরা আল্লাহর নামে কড়াকড়া কসম করে বলে যে, আল্লাহ মৃত ব্যক্তিদেরকে পুনর্জীবিত করবেন না। কেন করবেন না ? এত এমন এক প্রতিশ্রুতি যা পূরণ করা তাঁর (আল্লাহর) কর্তব্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক এটা জানে না। পুনর্জীবনের প্রয়োজন এ জন্যে যে, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল, তার প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ সেদিন উদ্‌ঘাটিত করবেন। এতে করে অবিশ্বাসীরা জানতে পারবে যে, তারা ছিল মিথ্যাবাদী। কোন কিছুর অস্তিত্ব দান করতে এর চেয়ে বেশী কিছু করতে হয় না, যখন বলি "হয়ে যা" আর তক্ষুণি তা হয়ে যায়।"-(সূরা আন নাহল ঃ ৩৮-৪০)

আল্লাহ তায়ালা এখানে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের বিবেকসম্মত ও নৈতিক প্রয়োজন বর্ণনা করছেন। মানব জন্মের প্রারম্ভ থেকেই প্রকৃত সত্য

সম্পর্কে বহু মতবিরোধ, মতানৈক্য হয়ে এসেছে। এসব মতানৈক্যের কারণে বংশ, জাতি ও গোত্রের মধ্যে ফাটল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হয়েছে। এসবের ভিত্তিতে বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভংগীর ধারক ও বাহকগণ তাদের পৃথক ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। এক একটি মতবাদের সমর্থনে ও তার প্রতিষ্ঠার জন্যে বিভিন্ন সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ জান-মাল, সম্মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছে। ভিন্ন মতাবলম্বীর সাথে রক্তাক্ত সংঘর্ষও হয়েছে। এক মতাবলম্বী লোক ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে। আক্রান্ত মতাবলম্বীগণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের আপন বিশ্বাস ও মতবাদ বর্জন করেনি। বিবেকও এটাই দাবী করে যে, এ ধরনের প্রচণ্ড মতবিরোধ সম্পর্কে এ সত্য অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, তাদের মধ্যে সত্য কোনটা ছিল এবং মিথ্যা কোনটা। কে ছিল সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কে পথভ্রষ্ট। দুনিয়ার বুকে এ সত্য উদঘাটনের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। দুনিয়াটার ব্যবস্থাই এমন যে, এখানে সত্য আবরণমুক্ত হওয়াই কঠিন। অতএব বিবেকের এ দাবী পূরণের জন্যে অন্য এক জগতের অস্তিত্বের প্রয়োজন।

এ শুধু বিবেকের দাবীই নয়, নীতি-নৈতিকতার দাবীও তাই। কারণ এসব বিরোধ ও সংঘাত-সংঘর্ষে বহু দল অংশগ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ করেছে অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং কেউ তা সহ্য করেছে। কেউ জান-মাল বিসর্জন দিয়েছে এবং কেউ তার সুযোগ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেকেই তার মতবাদ অনুযায়ী একটা নৈতিক দর্শন ও নৈতিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ভালো অথবা মন্দ প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়েছে। এখন এমন এক সময় অবশ্যই হওয়া উচিত যখন এসবের ফলাফল পুরস্কার অথবা শাস্তির রূপ নিয়ে প্রকাশিত হবে। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় যদি পরিপূর্ণ নৈতিক ফলাফল প্রকাশ সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই আর এক জগতের প্রয়োজন যেখানে তা পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ লাভ করবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ط وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

"তোমাদের সবাইকেই তার দিকে ফিরে যেতে হবে। এ আল্লাহ তায়ালার পাকাপোক্ত ওয়াদা। সৃষ্টির সূচনা অবশ্যই তিনি করেন এবং দ্বিতীয় বার সৃষ্টিও তিনি করবেন। দ্বিতীয়বার সৃষ্টির কারণ এই যে, যারা ঈমান আনার

পর সৎকাজ করেছে তাদেরকে তিনি ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রতিদান দিবেন। আর যারা অবিশ্বাসীদের পথ অবলম্বন করেছে তারা উত্তপ্ত পানি পান করবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। সত্যকে অস্বীকার করে তারা যা কিছু করেছে তার জন্যেই তাদের এ শাস্তি।"-(সূরা ইউনুস ঃ ৪)

এখানে পরকালের দাবী ও তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। দাবী করা হচ্ছে যে, পরকাল অর্থাৎ মানুষের পুনর্জীবন অবশ্যই হবে। এ কাজটা মোটেই অসম্ভব নয়। তার প্রমাণ স্বরূপ বলা হচ্ছে যে, যিনি একবার সৃষ্টি করতে পারেন তিনি তো বার বার সে কাজ করতে সক্ষম। অতএব একবার তিনিই যদি মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে দ্বিতীয়বার কেন পারবেন না ?

অতপর আখেরাতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। উপরের যুক্তি একথার জন্যে যথেষ্ট যে, দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি সম্পূর্ণ সম্ভব। এরপর বলা হচ্ছে, বিবেক ও ন্যায় নিষ্ঠার দিক দিয়ে পুনর্জীবনের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং এ প্রয়োজন পুনর্জীবন ব্যতীত কিছুতেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে স্রষ্টা ও প্রভু স্বীকার করার পর যারা সত্যিকার দাসত্ব ও আনুগত্যের জীবনযাপন করছে, ন্যায়সংগতভাবে তারা পুরস্কার লাভের অধিকার রাখে। আর যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে বিপরীত জীবনযাপন করছে তাদেরও কৃতকর্মের জন্যে পরিণাম ভোগ করা উচিত। কিন্তু এ প্রয়োজন দুনিয়ার জীবনে কিছুই পূরণ হলো না এবং হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এ প্রয়োজন পূরণের জন্যেই পুনর্জীবন বা আখেরাতের জীবন একান্ত আবশ্যক।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط

"প্রত্যেককেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। অতএব সেদিন যাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করে বেহেশ্‌তে স্থান দেয়া হবে তারাই হবে সাফল্যমণ্ডিত।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

এখানেও আখেরাতের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি পেশ করা হয়েছে। প্রথমেই এক পরীক্ষিত সত্যের কথা বলা হয়েছে এবং তাহলো এই যে, প্রতিটি মানুষ মরণশীল। প্রতিটি জীবকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হচ্ছে যেটা মানুষের এক দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতা।

অতপর এ দুনিয়ার বুকে মানুষ তার জীবদ্দশায় ভালো-মন্দ উভয় কাজই করে যাচ্ছে। ভালো এবং মন্দ কাজের যথার্থ প্রতিদান এখানে পাওয়া যাচ্ছে

না। একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি সারাজীবন ভালো করেও তার প্রতিদান পান না এবং একজন দুর্বৃত্ত সারা জীবন কুকর্ম করেও শাস্তি ভোগ করলো না। এসব অতি বাস্তব সত্য যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। অথচ সৎকাজের পুরস্কার এবং কুকর্মের শাস্তিও একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভালো কাজের জন্যে সঠিক এবং পরিপূর্ণ পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির জন্যেও যথোপযুক্ত শাস্তি যেহেতু এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় সম্ভব না, সে জন্যে মৃত্যুর পর আর একটি জীবনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○

"প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং এই দুনিয়াতে তোমাদেরকে সুখ-দুঃখ দিয়ে আমরা পরীক্ষা করব এবং এ পরীক্ষার ফলাফল লাভের জন্যে তোমাদেরকে আমাদের নিকটেই ফিরে আসতে হবে।"

–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩৫)

পরকাল সম্পর্কে কুরআনের যুক্তি

মৃত্যুর পর মানবদেহের অস্থি, চর্ম, মাংস ও অণু-পরমাণু ক্ষয়প্রাপ্ত হবার বহুকাল পরে তাদের পুনর্জীবিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই বলে অবিশ্বাসীরা যে উক্তি করে, তার জবাবে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتَٰبٌ حَفِيظٌ ○

"মাটি (মৃতদেহের) যা কিছুই খেয়ে ফেলে, তা সব আমাদের জানা থাকে। আর প্রতিটি অণু-পরমাণু কোথায় আছে তা আমাদের গ্রন্থেও সুরক্ষিত রয়েছে।"–(সূরা আল কাফ ঃ ৪)

খোদার পক্ষে পুনর্জীবন দান কি করে সম্ভব এ যদি জ্ঞানহীন অবিশ্বাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনায় না আসে তো সেটা তাদের জ্ঞানের সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। তার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা এ ব্যাপারে অপারগ। তারা মনে করে যে, আদিকাল থেকে যেসব মানুষ মৃত্যুবরণ করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, তাদের মৃতদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শূন্যতায় পরিণত হবার হাজার হাজার বছর পরে পুনর্বার তাদের দেহ ধারণ এক অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন যে, মানবদেহের ক্ষয়প্রাপ্ত অণু-পরমাণু মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞানের অগোচর হলেও, তাঁর জ্ঞানের অগোচর তা কখনো হয় না। সেসব কোথায় বিরাজ করছে তা আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞানেত আছেই, উপরন্তু তা পুংখানুপুংখরূপে লিপিবদ্ধ আছে সুরক্ষিত গ্রন্থে। আল্লাহর আদেশ মাত্রই তা পুনঃ একত্র হয়ে অবিকল পূর্বের দেহ ধারণ করবে। মানুষ শুধু পুনর্জীবিত হবে না, বরঞ্চ দুনিয়ায় তার যে দেহ ছিল, অবিকল সে দেহই লাভ করবে। এ আল্লাহর জন্যে কঠিন কাজ নয় মোটেই।

ঠিক এ ধরনের প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বহুস্থানেও দিয়েছেন ঃ

نَحْنُ خَلَقْنَٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۔

"আমি তোমাদেরকে পয়দা করেছি। তবে কেন এর (পরকালের) সত্যতা স্বীকার করছো না?"–(সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৫৭)

পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তি যদি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই তাকে পয়দা করেছেন, তাহলে দ্বিতীয় বারও যে তিনি তাকে পয়দা করতে পারেন, একথা স্বীকার করতে বাধা কেন?

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ○

"হে মানব জাতি ! কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে—এ বিষয়ে তোমরা যদি সন্দেহ পোষণ কর তাহলে মনে করে দেখ দেখি, আমি তোমাদেরকে প্রথম মাটি থেকে পয়দা করেছি। অতপর একবিন্দু বীর্য থেকে। অতপর রক্তপিণ্ড থেকে। অতপর মাংস পিণ্ড থেকে যার কিছু সংখ্যক হয় পূর্ণাংগ, কিছু রয়ে যায় অপূর্ণ। এতে করে তোমাদের সামনে আমার কুদরত প্রকাশ করি এবং আমি মাতৃগর্ভে যাকে ইচ্ছা তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রসবকাল পর্যন্ত রেখে দেই। অতপর তোমাদেরকে শৈশব অবস্থায় মাতৃগর্ভ থেকে বহির্জগতে নিয়ে আসি যাতে করে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যারা যৌবনের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে এবং এমনও আছে যারা দীর্ঘায়ু লাভ করে বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়। ফল এই হয় যে, কোন বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে আবার তোমরা সে বিষয়ে বেখেয়াল হয়ে যাও। (দ্বিতীয় কথা এই যে) তোমরা যমীনকে শুষ্ক পড়ে থাকতে দেখ। অতপর আমি যখন তার উপরে বারি বর্ষণ করি, তখন তা উর্বর ও সজীব হয়ে পড়ে এবং নানাপ্রকার সুন্দর শস্য উৎপন্ন করে।–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫)

উপরের ঘটনাগুলো বাস্তব সত্য যা হর-হামেশা ঘটতে দেখা যায়। তা কারো অস্বীকার করারও উপায় নেই। পরকাল অবিশ্বাসকারীগণ এসব সত্য বলে বিশ্বাস করলেও পরকালকে তারা বলে অবাস্তব। এ তাদের শুধু গায়ের জোরে অস্বীকার করা। নতুবা এর পেছনে কোন যুক্তি নেই।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভ্রম ঘুচাবার জন্যে তার জন্ম সহস্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○ نَحْنُ

قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ۝ عَلَى أَنْ نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُوْلَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

"তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে স্ত্রীসংগমে তোমরা স্ত্রী যোনীতে যে বীর্য প্রক্ষিপ্ত করছ, তা থেকে সন্তানের উৎপত্তি করছ কি তোমরা, না আমি ? আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু বন্টন করে দিয়েছি। তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে তোমাদের জ্ঞানবর্হিভূত অন্য আকৃতিতে পয়দা করতেও আমি অপারগ নই। তোমাদের প্রথম বারের সৃষ্টি সম্পর্কেও তোমরা পরিজ্ঞাত। তবে কেন শিক্ষা গ্রহণ করছ না ?"

–(সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৫৮-৬২)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে মানব জাতির সামনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। মানুষ সব যুক্তিতর্ক ছেড়ে দিয়ে শুধু তার জন্মরহস্য নিয়ে যদি চিন্তা করে, তাহলে সবকিছুই তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। অতপর খোদার অস্তিত্ব ও একত্ব এবং পরকাল সম্পর্কে তার মনে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকবে না।

আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করছেন, নারী-পুরুষের বীর্য একত্রে মিলিত হবার পর কি আপনা-আপনি তা থেকে সন্তানের সূচনা হয় ? সন্তান উৎপাদনের কাজটা কি মানুষের, না অন্য কোন শক্তির ? নারী এবং পুরুষের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, উভয়ের বীর্য সম্মিলিত হলেই তা থেকে তারা সন্তানের জন্ম দেবে ?

প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি উত্তর দেবে, "না-না-না, এ সবকিছুই মানুষের ক্ষমতার অতীত।"

নারী-পুরুষের সম্মিলিত বীর্য স্ত্রীর ডিম্বকোষে প্রবেশ করার পর থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব পর্যন্ত তার ক্রমবিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করুন।

নারী-পুরুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শুক্রকীট (Spermatzoa and ova) একত্রে মিলিত হবার পর কোষ (cell) এবং তা থেকে রক্ত পিণ্ডের সৃষ্টি হয়। কিছুকাল পরে বর্ধিত রক্তপিণ্ড একটা ক্ষুদ্র মানুষের আকৃতিতে পরিণত হয়। সে আকৃতি অনুপম, অদ্বিতীয়। অন্য কোনটার মত নয়। সে আকৃতি হতে পারে সুন্দর অথবা অসুন্দর। সমুদয় অংগ-প্রত্যংগ বিশিষ্ট অথবা বিকলাংগ। অতপর তাকে অসাধারণ প্রতিভা, জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অপূর্ব উদ্ভাবনা ক্ষমতার

উপাদানে ভূষিত করা, অথবা এর বিপরীত কিছু করা—এসব কি কোন মানব শিল্পীর কাজ ? না, খোদা ব্যতীত কোন দেব-দেবীর দৈত্য-দানবের কাজ ?

গর্ভাবস্থায় মানব সন্তানটির ক্রমবর্ধমান দেহের জন্যে বিচিত্র উপায়ে খাদ্যের সংস্থান এবং ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই এ দুনিয়ায় তার উপযোগী খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়স্থল এবং এক অকৃত্রিম স্নেহ-মায়া-মমতা-ঘেরা পরিবেশে তার লালন-পালনের অগ্রিম সুব্যবস্থাপনা সবকিছুই একই শিল্পীর পরিকল্পনার অধীন। সে সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় শিল্পী বিশ্বস্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ ব্যতীত কি আর কেউ ?

কেউ হয়তো বলবেন, এ সবকিছুই প্রকৃতির কাজ। কিন্তু 'প্রকৃতি' বলতে কি বুঝানো হয় ? তাদের মতো লোকেরা তো সব সৃষ্টিকেই দুর্ঘটনার পরবর্তী ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া (Action and Reaction after an accident) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু 'প্রকৃতির' নিজস্ব কোন জ্ঞান, পরিকল্পনা, প্রতিটি সৃষ্টির পৃথক পৃথক ডিজাইন, ইচ্ছা ও কর্মশক্তি, অথবা কোন কিছু করার এক্তিয়ার আছে কি ? আপনি যাকে 'প্রকৃতি' বলতে চান, সে-ও তো সেই বিশ্বস্রষ্টার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। আলো, বাতাস, আকাশের মেঘমালা, বারি বর্ষণ, বর্ষণের ফলে উদ্ভিদরাজির জন্মলাভ, চারিদিকের সুন্দর শ্যামলিমা, কুলকুল তানে বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনী, কুঞ্জে কুঞ্জে পাখীর কাকলি—এসবই তো একই মহাশক্তির নিপুণ হস্তে নিয়ন্ত্রিত।

উপরন্তু আল্লাহ বলেন যে, তিনি আমাদের মধ্যে মৃত্যু বন্টন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ সকলেই মরণশীল এবং সকলের আয়ু একরূপ নয়। কেউ ভূমিষ্ঠ হবার পর মুহূর্তেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। কেউ শতাধিক বছর বাঁচে। মৃত্যু যে কোন মুহূর্তেই অতি অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের দুয়ারে এসে পৌঁছে। তার আগমনের সময় ও ক্ষণ আল্লাহই নির্ধারিত করে রেখেছেন। তার এক মুহূর্ত অগ্র-পশ্চাৎ হবার জো নেই। কিন্তু কই মৃত্যু আসার পর তো কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে না। দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্রাট, যার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, তাকে শত চেষ্টা করেও কি কেউ ধরে রাখতে পেরেছে ? এমনি কত সন্তান তার পিতা-মাতাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে, কত প্রেমিক তার প্রিয়তমকে চির বিরহানলে প্রজ্জ্বলিত করে, কত মাতা-পিতা তাদের কচি সন্তানদেরকে এতিম অসহায় করে চলে যাচ্ছে মৃত্যুর পরপারে, কিন্তু কারো কিছু করার নেই এতে। বিজ্ঞান তার নব নব অত্যাশ্চার্য আবিষ্কারের গর্ব করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কি কেউ মৃত্যুর কোন ঔষধ আবিষ্কার করতে পেরেছে ? কেউ কি পেরেছে এর কোন প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে ? জীবন ও মৃত্যু এক অটল ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম-নীতির শৃংখলে বাঁধা।

এডভএমন এক শক্তিশালী হস্তের নিয়ন্ত্রণ যার ব্যতিক্রম স্রবার উপায় নেই। সেই শক্তির একচ্ছত্র মালিকই আল্লাহ তায়ালা। তিনি জীবন এবং মৃত্যুরও মাম্বিক। তিনি দুনিয়ারও মালিক প্রভু এবং পরকালেরও।

কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ একথাও ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মানব জাতিকে যে একই বাঁধাধরা পদ্ধতিতে পয়দা করতে সক্ষম তা নয়। মানুষের জ্ঞানবর্হিভূত অন্য আকৃতি ও পদ্ধতিতেও পয়দা করতে তিনি সক্ষম। তিনি আদি মানব হযরত আদমকে (আ) একভাবে পয়দা করেছেন। হযরত ঈসাকে (আ) জন্মগ্রহণের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করে পয়দা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে পুনর্বার পয়দা করতে শুক্রকীট আকারে কোন নারীর ডিম্বকোষে স্থাপন করার প্রয়োজন হবে না। যে শারীরিক গঠন ও বর্ধন নিয়ে সে মৃত্যুবরণ করেছে, ঠিক সেই আকৃতিতেই তাকে পুনঃ জীবন দান করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। অতএব এমনি রহস্যপূর্ণ সৃষ্টি নৈপুণ্যের মালিক যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম শক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে পরকাল অস্বীকার করা মূঢ়তা ছাড়া কি হতে পারে?

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "দুনিয়ার জীবনে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিচয়ের কর্মশক্তি একরূপ প্রদত্ত হয়েছে। পরকালে তা পরিবর্তন করে অন্যরূপ করতেও আমি সক্ষম। সেদিন তোমরা এমন কিছু দেখতে ও শুনতে পাবে যা এখানে পাও না। আজ তোমাদের চর্ম, হস্ত-পদ, চক্ষু প্রভৃতিতে কোন বাকশক্তি নেই। তোমাদের জিহ্বায় যে বাকশক্তি, সে তো আমারই দেয়া। ঠিক তেমনি পরকালে তোমাদের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগকে বাকশক্তি দান করতেও আমি সক্ষম। দুনিয়ায় আমি তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট আয়ু দান করেছি। যার ব্যতিক্রম কোনদিন হয়নি এবং হবে না। কিন্তু পরকালে আমার এ নিয়ম পরিবর্তন করে তোমাদেরকে এমন এক জীবন দান করব যা হবে অনন্ত, অফুরন্ত। আজ তোমাদের কষ্ট ভোগ করার একটা সীমা আছে যা অতিক্রম করলে তোমরা আর জীবিত থাকতে পার না। এখানকার জন্ম এবং মৃত্যু আমারই অমোঘ আইনের অধীন। পরকালে এ আইন পরিবর্তন করে তোমাদেরকে এমন এক জীবন দান করব যার অধীনে অনন্তকাল কঠিনতম শাস্তি ভোগ করেও তোমরা জীবিত থাকবে। এ তোমাদের ধারণার অতীত যে, বৃদ্ধ কখনো আবার যৌবন লাভ করবে। মানুষ একেবারে নিরোগ হবে, অথবা বার্ধক্য কাউকে স্পর্শ করবে না। এখানে যা কিছু ঘটছে, যথা ঃ শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যের পরপর আগমন, রোগের আক্রমণ ও আরোগ্য লাভ—সবইতো আমার এক অপরিবর্তনীয় বিধি-বিধান। পরকালে তোমাদের জীবনের এক নতুন বিধি-বিধান আমি রচনা করব। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ

করার সাথে সাথে চির যৌবন লাভ করবে। না তখন তার জীবনাকাশের পশ্চিম প্রান্তে তার যৌবন সূর্যের ঢলে পড়ার কোন সম্ভাবনা আছে, আর না তাকে কোনদিন সামান্যতম রোগও স্পর্শ করতে পারবে।"

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা তো নিশ্চয়ই জান যে, কোন এক রহস্যময় ও অলৌকিক পদ্ধতিতে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। কিভাবে পিতার বীর্যকোষ থেকে মাতৃগর্ভে এক ফোঁটা বীর্য স্থানান্তরিত হলো, যা হলো তোমাদের জন্মের কারণ। কিভাবে অন্ধকার মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে প্রতিপালন করে জীবিত মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় পাঠানো হলো। কিভাবে একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শুক্রকীটকে ক্রমবিকাশ ও ক্রমবর্ধনের মাধ্যমে এহেন মন, মস্তিষ্ক, হস্ত-পদ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু তার মধ্যে স্থাপন করা হলো সুসামঞ্জস্য করে। কিভাবে তাকে বিবেক, অনুভূতিশক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিভিন্ন শিল্প ও কলাকৌশল, অভূতপূর্ব উদ্ভাবনা শক্তি দান করা হলো। এ সবের মধ্যে যে অনুপম অলৌকিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তা কি মৃতকে জীবিত করার চেয়ে কোন অংশে কম ? এ অলৌকিক ঘটনা তো তোমরা দিবারাত্র কত শতবার স্বচক্ষে অবলোকন করছ। এরপরেও কেন তবে পরকালের প্রতি অবিশ্বাস।"

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ○ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ○ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ○ اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○ اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

(আখেরাত অবিশ্বাসী) বলে, "মৃত্যুর পর হাড়-মাংস ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর এমন কে আছে যে, এগুলোকে পুনর্জীবিত করবে ?" (হে নবী) তাকে বলো, "প্রথমে তাকে যিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই তাকে পুনর্জীবন দান করবেন। তাঁর সৃষ্টিকৌশল্যে পরিপূর্ণ দক্ষতা আছে। তিনিই তো তোমাদের জন্যে শ্যামল বৃক্ষরাজি থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তাই দিয়ে তোমরা তোমাদের উনুন জ্বালাও। যিনি আসমান যমীন পয়দা করেছেন, তিনি কি এ ধরনের কিছু পয়দা করতে সক্ষম নন ? নিশ্চয় সক্ষম। তিনি তো নিপুণ সৃষ্টিকৌশল্যে অতি দক্ষ। তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু হুকুম করেন যে, হয়ে যা, আর তখন তা হয়ে যায়।"

–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮-৮২)

পুনর্জীবন সম্পর্কে এর চেয়ে বড়ো যুক্তি আর কি হতে পারে ? দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারকের কথাই ধরা যাক যে ব্যক্তি শত শত ঘড়ি তৈয়ার করছে। তার চোখের সামনে একটি ঘড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যদি কেউ বলে এ ঘড়ি আর পুনরায় কিছুতেই তৈরী করা যাবে না। তাহলে তার নির্বুদ্ধিতা সকলেই স্বীকার করবে। নিত্য নতুন ঘড়ি তৈরী করাই যার কাজ সে একটা ভাঙা ঘড়ির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশগুলোর সমন্বয়ে অবিকল আর একটি ঘড়ি নিশ্চয়ই তৈরী করতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও শিল্পী প্রথমবার মানুষকে বিচিত্র উপায়ে যেসব উপাদান দিয়ে তৈরী করেছেন পুনর্বার তিনি তা পারবেন না এ চিন্তাটাই অদ্ভূত ও হাস্যকর। একটা পূর্ণাংগ মানুষ সৃষ্টির পশ্চাতে ক্রমবিকাশ ক্রিয়াঁশীল থাকে। প্রথমে নারী গর্ভে একটি কোষ অতপর রক্তপিণ্ড, অতপর মাংস পিণ্ড, অতঃপর একটা পূর্ণাংগ মানুষ। এ ক্রমবিকাশের পশ্চাতে একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাই কাজ করে। মানুষ সৃষ্টির এমন ক্রমিক পদ্ধতি থাকলেও আল্লাহর হুকুম হওয়া মাত্রই কোন কিছু অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। এ ক্ষমতাও তাঁর আছে। অতএব মৃত্যুর পর মানুষের পুনর্জীবনলাভের জন্যে নারী গর্ভের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আসার প্রয়োজন হবে না এবং আল্লাহর ইচ্ছাও তা নয়। শুধু প্রয়োজন তাঁর ইচ্ছা এবং নির্দেশের। তাঁর ইচ্ছা এবং নির্দেশে মানবদেহের ক্ষয়প্রাপ্ত অণু-পরমাণুগুলো সমন্বিত হয়ে মুহূর্তেই রক্ত-মাংস অস্থি-চর্মের একটি পূর্ণাংগ মানুষ হয়ে জীবিত অবস্থায় অস্তিত্ব লাভ করবে। এ এক অতি সহজ ও বোধগম্য কথা।

পরকালের ঐতিহাসিক যুক্তি

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা পরকালের বর্ণনা প্রসংগে একদিকে যেমন অলৌকিক সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে মানুষকে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান জানিয়েছেন, অপর দিকে পরকালের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অতীতের ঘটনাপুঞ্জকে সাক্ষী রেখেছেন।

وَالطُّوْرِ ۝ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝

مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝

"তুর পর্বতের শপথ। সেই প্রকাশ্য পবিত্র গ্রন্থের শপথ যা লিপিবদ্ধ আছে মসৃণ চর্ম ঝিল্লিতে। আরো শপথ বায়তুল মা'মুর সুউচ্চ আকাশ, এবং উচ্ছ্বসিত তরঙ্গায়িত সমুদ্রের। তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি অবশ্যই সংঘটিত হবে যা কেউ রোধ করতে পারবে না।"-(সূরা আত তূর ঃ ১-৮)

আলোচ্য আয়াতে শাস্তি বলতে পরকালকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ পরকাল তার অবিশ্বাসীদের জন্যে নিয়ে আসবে অতীব ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পরকাল যে এক অবশ্যম্ভাবী সত্য তা মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে আল্লাহ তায়ালা পাঁচটি বস্তুর শপথ করেছেন। অর্থাৎ এ পাঁচ বস্তু পরকালের সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে।

প্রথমত তূর পবর্তের কথাই ধরা যাক। এ এমন এক ঐতিহাসিক পবিত্র পর্বত যার উপরে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসার (আ) সংগে কথোপকথন করে তাঁকে নবুয়তের শিরস্ত্রানে ভূষিত করেছিলেন। এতদ প্রসংগে একটি দুর্দান্ত প্রতাপশালী জাতির অধঃপতন এবং অন্য একটি উৎপীড়িত ও নিষ্পেষিত জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের সিদ্ধান্তও এ স্থানে গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত দুনিয়ার সংখ্যা ও শক্তিভিত্তিক আইনের (Physical Law) বলে গৃহীত হয়নি। বরঞ্চ গৃহীত হয়েছিল নৈতিক আইন (Moral Law) এবং কুকর্মের শাস্তিদান আইন (Law of Retribution) অনুযায়ী। অতএব পরকালের সত্যতার ঐতিহাসিক প্রমাণের জন্যে তূর পবর্তকে একটা নিদর্শন হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

কিভাবে একটা বিশাল ভূ-খণ্ডের অধিপতি মানুষের উপরে খোদায়ীর দাবীদার শক্তিমদমত্ত ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী ও অমাত্যবর্গসহ লোহিত সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত হয়েছিল, তার সিদ্ধান্ত তূর পর্বতের উপরে সেই

মহান রাত্রিতে গৃহীত হয়েছিল। আর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল নিরস্ত্র, নিরীহ, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত বনী ইসরাঈলকে গোলামীর শৃঙ্খল থেকে চিরমুক্ত করার।

বিশ্বজগতের মালিক প্রভু আল্লাহ্ তায়ালা জ্ঞান-বিবেকমণ্ডিত এবং স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি সম্পন্ন মানুষের যে নৈতিক বিচারের দাবী রাখেন, উপরোক্ত ঘটনা মানব ইতিহাসে তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে অটুট আছে ও থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ তায়ালার এ দাবী পরিপূরণের জন্যে এমন এক বিচার দিবসের অবশ্যই প্রয়োজন যে দিন বিশ্বের সমগ্র মানব জাতিকে একত্র করে তাদের চুলচেরা বিচার করা হবে। আর সেটা যুক্তিযুক্ত হবে মানব জীবনের অবসানের পরেই। সামান্য অন্যায় অবিচার করেও সেই বিচার দিনে কেউ রেহাই পাবে না।

আলোচ্য আয়াতে পবিত্র গ্রন্থ বলতে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী যথা ঃ তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থাবলী সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। এ গ্রন্থাবলী তখনো বহু লোকের কাছে রক্ষিত ছিল। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে অন্যান্য নবীগণ পরকাল সম্পর্কে সেই মতবাদই পেশ করেছেন, যা শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) পেশ করেছেন কুরাইশদের সামনে। প্রত্যেক নবী একথাটিই বলেছেন যে, সমগ্র মানবজাতিকে একদা খোদার সম্মুখে একত্র করা হবে এবং তখন প্রত্যেককেই আপন কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। কোন নবীর প্রতি এমন কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়নি, যার মধ্যে পরকালের কোন উল্লেখ নেই, অথবা এমন কথা বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পরকাল বলে কিছু নেই।

অতপর আল্লাহ্ তায়ালা বায়তুল মা'মুরের শপথ করেছেন। প্রত্যেক আকাশে* এবং বেহেশ্তে একটি করে পবিত্র গৃহ প্রতিষ্ঠিত আছে যাকে কেবলা করে ফেরেশ্তাগণ এবং আকাশবাসী আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করে থাকেন। মক্কার পবিত্র কাবাগৃহকে দুনিয়ার বায়তুল মা'মুর বলা হয়। কারণ এ গৃহ বেহেশতের 'বায়তুল মা'মুরের' অনুকরণেই প্রথম ফেরেশতাগণ কর্তৃক এবং পরে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

পবিত্র কাবাগৃহ কয়েকটি বিষয়ের জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে। আল্লাহর নবীগণ যে সত্য, তাঁর অনন্ত হিকমত ও অসীম কুদরত যে এ পবিত্র গৃহকে আবেষ্টন করে আছে, তা দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট।

---

* প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সপ্ত আকাশের কথা বহুস্থানে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সজ্জিত বলা হয়েছে। এ মানুষের জ্ঞানসীমার বহির্ভূত। এ সম্পর্কে বিজ্ঞান এখনো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি।

এ পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হবার প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে (মতান্তরে চার হাজার বছর) পাহাড়-পর্বত ঘেরা জনমানবহীন এক বারিহীন প্রান্তরে এক ব্যক্তি তাঁর প্রিয়তমা পত্নি ও একমাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানকে নির্বাসিত করে চলে যাচ্ছেন। কিছুকাল পর আবার সেই ব্যক্তিই উক্তস্থানে আল্লাহর এবাদতের জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন, "হে মানবজাতি তোমরা চলে এসো এ পবিত্র গৃহের দর্শন লাভ কর এবং হজ্ব সমাধা কর।"

তাঁর সে আহ্বানে এমন এক চুম্বক শক্তি ছিল এবং তা মানুষের হৃদয়-মন এমনভাবে জয় করে ফেলে যে, গৃহটি সমগ্র আরব দেশের কেন্দ্রীয় আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়। সেই মহান আহ্বানকারী আর কেউ নন—তিনিই মহিমান্বিত নবী হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। তাঁর আহ্বানে আরবের প্রতিটি নগর ও পল্লী প্রান্তর থেকে অগণিত মানুষ লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, (আমরা হাযীর, আমরা হাযীর, হে আল্লাহ, আমরা হাযীর) ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করে ছুটে এসেছে সে গৃহের দর্শনলাভের জন্যে। কারণ সেটা ছিল আল্লাহর ঘর।

গৃহটি নির্মাণের পর থেকে হাজার হাজার বছর পরে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তা শান্তি ও নিরাপত্তার লালনাগার রূপে বিরাজ করেছে এবং তা এখনো করছে।

সেকালে আরবের চতুর্দিকে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে, রক্তের হোলিখেলা চলেছে। কিন্তু এ পবিত্র গৃহের নিটকবর্তী হয়ে দুর্দমনীয়, রক্তপিপাসুরও বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে পড়েছে। এর চতুঃসীমার ভেতরে কারো হস্ত উত্তোলন করার দুঃসাহস হয়নি কখনো। এ ঘরের বদৌলতে আরববাসী এমন চারটি পবিত্র মাস লাভ করতে সক্ষম হয়েছে যে, এ মাসগুলোতে সর্বত্র বিরাজ করেছে শান্তি ও জানমাল ইজ্জতের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা। এ সময়ে তারা ব্যবসার পণ্যদ্রব্য নিয়ে নির্বিঘ্নে যথেচ্ছ গমনাগমন করেছে। ব্যবসাও তাদের জমে উঠেছে বাড়ন্ত শস্যের মতো।

এ পবিত্র গৃহের এমনই এক অত্যাশ্চর্য মহিমা ছিল যে, কোন প্রতাপশালী দিগ্‌বিজয়ীও এর দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেনি। এ পবিত্র বাণী অবতীর্ণ হবার মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে এক অপরিণামদর্শী ক্ষমতা গর্বিত শাসক[১] এ গৃহকে ধূলিস্মাত করার উদ্দেশ্যে অভিযান চালিয়েছিল। তাকে

১. ইয়ামেনের শাসনকর্তা খৃষ্টান আবরাহা কা'বা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সৈন্য পরিচালনা করেছিল। শেষ নবীর (সা) জন্মের মাত্র পঞ্চাশ দিন পূর্বের ঘটনা। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুয়্যত লাভ করেন। তার পাঁচ বছর পর 'সূরা তূর' অবতীর্ণ হয়।

প্রতিহত করার কোন শক্তি তখন গোটা আরবে ছিল না। কিন্তু এ গৃহ স্পর্শ করা তো দূরের কথা, তার চতুঃসীমার বাইরে থাকতেই সে তার বিরাট বাহিনীসহ বিধ্বস্ত হয়েছে পরিপূর্ণরূপে। তাদের অস্থি-মাংস চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে এক অলৌকিক উপায়ে। এ ঘটনা যারা স্বচক্ষে দেখেছে, তাদের বহু লোক তখনো জীবিত ছিল যখন এ ঘটনার উল্লেখ করা হয়।

এসব কি একথারই প্রকৃত প্রমাণ নয় যে, আল্লাহর নবীগণ কোন কাল্পনিক কথা বলেন না ? তাঁদের চক্ষু এমন কিছু দেখতে পায়, যা অপরের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁদের কণ্ঠে এমন সত্য ও তথ্য উচ্চারিত হয় যা হৃদয়ংগম করার ক্ষমতা অন্যের হয় না। তারা এমন কিছু বলেন ও করেন যে, সমসাময়িক অনেকে তাঁদেরকে পাগল বলে অভিহিত করে। আবার শতাব্দী অতীত হওয়ার পর মানুষ তাঁদের বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। এ ধরনের মহামানব যখন প্রত্যেক যুগে একই সত্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন যে পরকাল অবশ্যই হবে, তখন তার প্রতি অবিশ্বাস হঠকারিতা ছাড়া আর কি বলা যায় ?

অতপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি নৈপুণ্যের নিদর্শন সুউচ্চ আকাশের উল্লেখ করে তাকে পরকালের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে পেশ করছেন। বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও বিজ্ঞানীরা আকাশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হননি। আকাশের বিস্তৃতি কত বিরাট ও বিশাল এবং তার আরম্ভ ও শেষ কোথায়, এখনো তা তাঁদের জ্ঞান বহির্ভূত। মাথার উপরে যে অনন্ত শূন্যমার্গ দেখা যায়, যার মধ্যে কোটি কোটি মাইল ব্যবধানে অবস্থিত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি বিচরণ করছে, সেই অনন্ত শূন্যমার্গই কি আকাশ, না তার শেষ সীমায় আকাশের শুরু তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। যে আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, সেই গতিতে চলা শুরু করে এখনো অনেক তারার আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছায়নি। এ তারাগুলো যেখানে অবস্থিত পৃথিবী হতে তার দূরত্ব এখনো পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

বিজ্ঞানীদের কাছে আকাশ এক মহা বিস্ময় সন্দেহ নেই। তাঁদের মতে সমগ্র আকাশের একাংশ যাকে Galaxy (ছায়া পথ) বলে, তারই একাংশে আমাদের এ সৌরজগত। এই একটি Galaxy-এর মধ্যেই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি বিদ্যমান। বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষায় অন্তত দশ লক্ষ Galaxy-এর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এসব অগণিত ছায়া পথের (Galaxy) মধ্যে যেটি আমাদের অতি নিকটবর্তী, তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে দশ লক্ষ বছর সময় লাগে। অথচ সে আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

সমগ্র উর্ধ্বজগতের যে সামান্যতম অংশের জ্ঞান এ যাবত বিজ্ঞান আমাদেরকে দিয়েছে, তারই আয়তন এত বিরাট ও বিশাল। এ সবের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কুদরত ও জ্ঞানশক্তি যে কত বিরাট, তা আমাদের কল্পনার অতীত। এ ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান মহাসমুদ্রের তুলনায় জলবিন্দুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর। এখন এই অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি রাজ্যকে যে খোদা অস্তিত্বদান করেছেন, তার সম্পর্কে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানব যদি এমন মন্তব্য করে যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান অথবা মহাপ্রলয় ও ধ্বংসের পর নতুন এক জগত সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে বলতে হবে যে, তার চিন্তা রাজ্যে অবশ্যই কোন বিশৃংখলা ঘটেছে।

অতপর দেখুন, পৃথিবীর বুকে উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গায়িত সমুদ্ররাজির অবস্থান কি কম বিস্ময়কর ? পৃথিবীর তিন ভাগ জল, একভাগ স্থল। একথা ভূগোল বলে। সমুদ্রের অনন্ত বারিরাশি ও স্থলভাগের গুরুভারসহ পৃথিবীটা শূন্যমার্গে লাটিমের মত নিয়ত ঘুরছে। চিন্তা করতে মানুষের মাথাটাও ঘুরে যায়।

যদি কেউ গভীর মনোযোগ সহকারে এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে সমুদ্র সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে তাহলে তার মন সাক্ষ্য দেবে যে, পৃথিবীর উপরে অনন্ত বারিরাশির সমাবেশ এমন এক সৃষ্টি নৈপুণ্য যা কখনো হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার ফল নয়। অতপর এত অসংখ্য হিকমত তার সাথে সংশ্লিষ্ট যে এত সুষ্ঠু সুন্দর বিজ্ঞতাপূর্ণ ও সুসামঞ্জস্য ব্যবস্থাপনা কোন সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা ব্যতীত হঠাৎ আপনা আপনি হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

সমুদ্র গর্ভে অসংখ্য অগণিত প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আকৃতি ও গঠনপ্রণালী বিভিন্ন প্রকারের। যেরূপ গভীরতায় যার বাসস্থান নির্ণয় করা হয়েছে, তার ঠিক উপযোগী করেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমুদ্রের পানি করা হয়েছে লবনাক্ত। তার কারণে প্রতিদিন তার গর্ভে অসংখ্য জীবের মৃত্যু ঘটলেও তাদের মৃতদেহ পঁচে-গলে সমুদ্রের পানি দূষিত হয় না। বারিরাশির বৃদ্ধি ও হ্রাস এমনভাবে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়েছে যে, তা কখনো সমুদ্রের তলদেশে ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে নিঃশেষ হয়ে যায় না। অথবা প্রবল আকারে উচ্ছ্বসিত হয়ে সমগ্র স্থলভাগ প্লাবিত করে না। কোটি কোটি বছর যাবত নির্ধারিত সীমার মধ্যেই তার হ্রাস বৃদ্ধি সীমিত রয়েছে। এ হ্রাস বৃদ্ধিও সৃষ্টিকর্তারই নির্দেশে হয়ে থাকে।

সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রের বারিরাশি থেকে বাষ্প সৃষ্টি হয়ে উর্ধ্বে উত্থিত হয়। তা থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘমালা বায়ু চালিত হয়ে স্থলভাগে বিভিন্ন অঞ্চল বারিশিক্ত করে। বারিবর্ষণের ফলে শুধু মানুষ কেন, স্থলচর জীবের জীবন ধারণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন হয়।

সমুদ্রগর্ভ থেকেও মানুষ তার প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী আহরণ করে। সংগ্রহ করে অমূল্য মণিমুক্তা, প্রবাল, হীরা জহরত। তার বুক চিরে দেশ থেকে দেশান্তরে জাহাজ চলাচল করে। অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। স্থান থেকে স্থানান্তরে মানুষের গমনাগমন হয়। স্থলভাগ ও মানবজাতির সাথে এই যে গভীর নিবিড় মংগলকর সম্পর্ক এ এক সুনিপুণ হস্তের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব। হঠাৎ ঘটনাচক্র দ্বারা পরিচালিত কোন ব্যবস্থাপনা এটা কিছুতেই নয়।

উপরোক্ত আলোচনার ফলে একি এক অনস্বীকার্য সত্য বলে গৃহীত হবে না যে, এক অদ্বিতীয় মহাশক্তিশালী খোদাই মানুষের প্রতিষ্ঠা ও জীবন ধারণের জন্যে অন্যান্য অগণিত প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর সাথে সমুদ্রকেও এমন মহিমাময় করে সৃষ্টি করেছেন ?

তাই যদি হয়, তাহলে একমাত্র জ্ঞানহীন ব্যক্তিই একথা বলতে পারে যে, তার জীবন ধারণের জন্যে খোদা তো সমুদ্র থেকে মেঘের সঞ্চার করে তার ভূমি সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা করে দেবেন। কিন্তু তিনি তাকে কখনো একথা জিজ্ঞেস করবেন না যে, একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহে জীবন ধারণ করে সে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে, না নাফরমানী করেছে। উত্তাল সমুদ্রকে সংযত ও অনুগত রেখে তার মধ্যে জলযান পরিচালনা করার শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি তো আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাকে কোনদিন একথা জিজ্ঞেস করবেন না যে, সে জলযান সে ন্যায় ও সত্য পথে পরিচালনা করেছিল, না অপরের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য। এ ধরনের চিন্তা ও উক্তি যারা করে তাদেরকে চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত বললে কি ভুল হবে ?

যে শক্তিশালী খোদার অসীম কুঁদরতের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন এই অনন্ত রহস্যময় সমুদ্রের সৃষ্টি, যিনি শূন্যমার্গে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী পৃষ্ঠে অনন্ত বারিরাশির ভাণ্ডার করে রেখেছেন, যিনি অফুরন্ত লবণ সম্পদ বিগলিত করে সমুদ্র গর্ভে মিশ্রিত করে রেখেছেন, যিনি তার মধ্যে অসংখ্য জীব সৃষ্টি করে তাদের খাদ্য সংস্থান করে দিয়েছেন, যিনি প্রতি বছর লক্ষ কোটি গ্যালন পানি তা থেকে উত্তোলন করে লক্ষ কোটি একর শুষ্ক ভূমি বারিশিক্ত করেন, তিনি মানবজাতিকে একবার পয়দা করার পর এমনই শক্তিহীন হয়ে পড়েন যে, পুনর্বার আর তাকে পয়দা করতে সক্ষম হবেন না। এ ধরনের প্রলাপোক্তি ও অবান্তর কথা বললে আপনি হয়তো বলবেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

পবিত্র কুরআনে পরকালের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এমনি ভুরি ভুরি অকাট্য যুক্তি পেশ করেছেন। এসবের পর পরকাল সম্পর্কে তার কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

দুনিয়া মানুষের পরীক্ষা ক্ষেত্র

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط

তিনিই মৃত্যু ও জীবন দিয়েছেন যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের (কৃতকর্মের) দিক দিয়ে কে সর্বোত্তম।"-(সূরা আল মুলক ঃ ২)

দুনিয়া যে মানুষের পরীক্ষা ক্ষেত্র তা কুরআনের অন্যত্রও কয়েক স্থানে বলা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ পরীক্ষাই দিতে থাকে। মৃত্যুর সাথে সাথেই তার পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। পরীক্ষা শেষ হলো বটে, কিন্তু তার ফলাফল কিছুই জানা গেল না। আর ফলাফল ঘোষণা ব্যতীত পরীক্ষা অর্থহীন। আর আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে তা জানার জন্যেই তো পরীক্ষা। যে পরীক্ষা দিল সেতো মৃত্যুবরণ করলো। পরীক্ষায় সে কৃতকার্য হলো, না অকৃতকার্য তাতো জানা গেল না। এখন ফলাফল প্রকাশের পূর্বেই যখন মৃত্যু হলো, তখন ফলাফল জানার জন্যেই মৃত্যুর পর আর একটি জীবনের অবশ্যই প্রয়োজন। সেটাই আখেরাতের জীবন।

তাহলে কথা এই দাঁড়ালো যে, মানুষ তার জীবন ভর যে পরীক্ষা দিল তার ফলাফল মৃত্যুর পর প্রকাশ করা হবে। তার জন্যে এক নতুন জগতে প্রতিটি মানুষকে পুনর্জীবন দান করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজীর করা হবে। যাকে বলা হয় হাশরের ময়দান। এ দরবার থেকেই মানুষের পরীক্ষার সাফল্য ও ব্যর্থতা ঘোষণা করা হবে। সাফল্যলাভকারীদের বেহেশতে এবং ব্যর্থকামীদের জাহান্নামে প্রবেশের আদেশ করা হবে।

ভালো-মন্দো, চূড়ান্ত ঘোষণা যদিও আখেরাতের আদালতে করা হবে, কিন্তু মৃত্যুর সময়ই প্রত্যেকে বুঝতে পারবে যে, তার স্থান কোথায় হবে। মৃত্যুকালে ফেরেশতাদের আচরণেই তারা তা বুঝতে পারবে। যথাস্থানে এ আলোচনা করা হবে।

আলমে বরযখ

একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে উদয় হয়। তাহলো এই যে, মৃত্যুর পর মানবাত্মা তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় যায় এবং কোথায় অবস্থান করে। কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর হয় বেহেশত না হয় জাহান্নাম এর কোন একটি তার স্থায়ী বাসস্থান হবে। কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে যে সুদীর্ঘ সময়কাল এ সময়ে আত্মা থাকবে কোথায় ?

এর জবাবও কুরআন পাকে পাওয়া যায়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরের কালটাকে যদিও পরকালের মধ্যে গণ্য করা হয়—তথাপি মৃত্যু ও বিচার দিবসের মধ্যবর্তী কালের একটা আলাদা নাম দেয়া হয়েছে যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়—আলমে বরযখ।

'বরযখ' শব্দের অর্থ ঃ যবনিকা পর্দা। আলমে বরযখ অর্থ পর্দায় ঢাকা এক অদৃশ্য জগত। অথবা এ বস্তুজগত ও পরকালের মধ্যে এক বিরাট যবনিকার কাজ করছে অদৃশ্য আলমে বরযখ।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ۝

"এবং তাদের পেছনে রয়েছে 'বরযখ' যার মুদ্দৎকাল হচ্ছে সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাদেরকে পুনর্জীবিত ও পুনরুত্থিত করা হবে।"

–(সূরা মু'মেনুন ঃ ১০০)

ইসলামে চার প্রকার জগতের ধারণা দেয়া হয়েছে। প্রথম, আলমে আরওয়াহ—আত্মিক জগত। দ্বিতীয়, আলমে আজসাম—স্থূলজগত বা বস্তুজগত (বর্তমান জগত)। তৃতীয়, আলমে বরযখ—মৃত্যুর পরবর্তী পর্দাবৃত অদৃশ্য জগত। চতুর্থ, আলমে আখেরাত—পরকাল বা পুনরুত্থানের পরে অনন্তকালের জগত।

আদি মানব হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পর কোন এক মুহূর্তে আল্লাহর আদেশ মাত্রই মানব জাতির সমুদয় আত্মা অস্তিত্বলাভ করে। এ সবের সাময়িক অবস্থান সেই আলমে আরওয়াহ বা আত্মিকজগত।

এ আত্মাগুলোকে (অশরীরি অথবা সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট মানব সন্তানগুলো) একদা একত্রে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

"আমি কি তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভু নই ?" সকল আত্মাই সমস্বরে জবাব দেয়—নিশ্চয়ই, আপনিই আমাদের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক।

এভাবে দুনিয়ার জন্যে সৃষ্ট সকল আত্মা অর্থাৎ মানুষের কাছে আল্লাহ তাঁর দাসত্ব আনুগত্যের স্বীকৃতি গ্রহণ করেন। কারণ প্রভু বলে স্বীকার করলেই দাসত্ব আনুগত্যের স্বীকৃতি হয়ে যায়। দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে এ আত্মাগুলো যে স্থানে অবস্থান করতো এবং এখনো করছে সেটাই হলো আলমে আরওয়াহ —আত্মাগুলোর অবস্থানের জগত।

অতপর এ দুনিয়ার মানুষের আগমনের পালা যখন শুরু হলো তখন সেই সূক্ষ্ম আত্মিক জগত থেকে এ স্থুল জগতে এক একটি করে আত্মা স্থানান্তরিত (Transferred) হতে লাগলো। মাতৃগর্ভে সন্তানের পূর্ণ আকৃতি গঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ মাত্র নির্দিষ্ট আত্মা বা অশরীরি মানুষটি আত্মিক জগত থেকে মাতৃগর্ভস্থ মনুষ্য আকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে। অতপর নির্দিষ্ট সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে দুনিয়ায় পদার্পণ করে।

মৃত্যুর পর আবার স্থুল জগত থেকে আত্মা আলমে বরযখে স্থানান্তরিত হয়। আত্মা দেহ ত্যাগ করে মাত্র। তাঁর মৃত্যু হয় না।

আলমে বরযখের বিশেষভাবে যে নির্দিষ্ট অংশে আত্মা অবস্থান করে সে বিশেষ অংশেরই নাম 'কবর'। কিন্তু সকলের কবর একই ধরনের হবে না। কারো কারো কবর হবে—আল্লাহ তায়ালার মেহমানখানার (Guest House) মতো। কারো কারো কবর হবে—অপরাধীদের জন্যে নির্দিষ্ট জেলখানার সংকীর্ণ কুঠরির মতো।

নির্দিষ্টকাল অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী মানুষের আত্মাগুলো এখানে অবস্থান করবে।

কবরের বর্ণনা

মৃত্যুর পরবর্তী কালের বর্ণনা প্রসংগে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কবরের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাক্ ইসলামী যুগে আরবের পৌত্তলিকগণ এবং ইয়াহুদী নাসারা নির্বিশেষে সকলেরই মৃতদেহ কবরস্থ করত।

স্থূল ও বাহ্য দৃষ্টিতে কবর একটি মৃত্তিকাগর্ত মাত্র যার মধ্যে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। মাটি সে মৃতদেহ ভক্ষণ করে ফেলে। কিন্তু সত্যিকার কবর এক অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতের বস্তু। যা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত। উপরে বলা হয়েছে যে, কবর আলমে বরযখের অংশ বিশেষ।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ কবরস্থ হোক অথবা চিতায় ভস্মিভূত হোক, বন্য জন্তুর উদরস্থ হোক অথবা জলমগ্ন হয়ে জলজন্তুর আহারে পরিণত হোক, তার দেহচ্যুত আত্মাকে যে স্থানটিতে রাখা হবে সেটাই তার কবর। হযরত ইসরাফিলের (আ) তৃতীয় সাইরেন ধ্বনির সংগে সংগে নতুন জীবন লাভ করে প্রত্যেকে কবর থেকে উঠে বিচারের মাঠের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে।

ফেরাউন তার সেনাবাহিনীসহ লোহিত সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে। বিরাট বাহিনী হয়তো জলজন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে। অথবা তাদের অনেকের ভাসমান লাশ তটস্থ হওয়ার পর শৃগাল, কুকুর ও চিল-শকুনের আহারে পরিণত হয়েছে। ফেরাউনের মৃত দেহ হাজার হাজার বছর ধরে মিসরের যাদু ঘরে রক্ষিত আছে, যাকে কেউ ইচ্ছা করলে এখনো স্বচক্ষে দেখতে পারে। কিন্তু তাদের সকলের আত্মা নিজ নিজ কবরেই অবস্থান করছে। তাদের শাস্তিও সেখানে অব্যাহত রয়েছে।

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَامَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ۚ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ○

"আল্লাহ (ফেরাউন জাতির মধ্যে ঈমান আনয়নকারী মু'মেন ব্যক্তিকে) তাদের ষড়যন্ত্রের কুফল থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন দলকে (তাদের মৃত্যুর পর) কঠিন আযাব এসে ঘিরে ফেললো। (সেটা হলো জাহান্নামের আগুনের আযাব)। তারপর কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে,

তখন আদেশ হবে, "ফেরাউন ও তার অনুসারী দলকে অধিকতর কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর।"-(সূরা আল মু'মেন ঃ ৪৫-৪৬)

আলমে বরযখে পাপীদেরকে যে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে উপরের আয়াতটি তার একটি প্রকৃত প্রমাণ। "আযাবে কবর"-শীর্ষক অনেক হাদীসও বর্ণিত আছে। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টরূপে দু' পর্যায়ের আযাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এক পর্যায়ের অপেক্ষাকৃত লঘু আযাব কিয়ামতের পূর্বে ফেরাউন ও তার দলের প্রতি দেয়া হচ্ছে। তা এই যে, তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের অগ্নির সামনে হাজির করা হচ্ছে যাতে করে তাদের মধ্যে এ সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় যে, অবশেষে এ জাহান্নামের অগ্নিতে, তাদেরকে একদিন নিক্ষেপ করা হবে। অতপর কিয়ামত সংঘটিত হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সে বিরাট শাস্তি দেয়া হবে যা তাদের জন্য নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ সেই জাহান্নামে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, যার ভয়ংকর দৃশ্য তাদেরকে দেখানো হচ্ছে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর থেকে।

এ শুধু মাত্র ফেরাউন ও তার অনুসারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। বরঞ্চ প্রত্যেক পাপীকে তার মৃত্যুর পরক্ষণ থেকে আরম্ভ করে কিয়ামত পর্যন্ত সেই ভয়াবহ পরিণাম তার চোখের সামনে তুলে ধরা হবে যা তাকে অবশেষে ভোগ করতেই হবে। অপরদিকে আল্লাহ নেক বান্দাদেরকে সুন্দর বাসস্থানের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখানো হতে থাকবে যা আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। বোখারী মুসলিম এবং মসনদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

ان احدكم اذا مات عرض عليه باغدت والعشى ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل اليه يوم القيمة ـ

"তোমাদের যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাকে তার অন্তিম বাসস্থান সকাল সন্ধ্যায় দেখানো হয়। সে বেহেশতী হোক অথবা জাহান্নামী, তাকে বলা হয়, এটা সেই বাসস্থান যেখানে তুমি তখন প্রবেশ করবে যখন আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিনে দ্বিতীয়বার জীবনদান করে তাঁর কাছে তোমাকে হাজির করবেন।"

মৃত্যুর পর পরই কবরে বা আলমে বরযখে পাপীদের শাস্তি ও নেককার বান্দাহদের সুখ শান্তির কথা কুরআন হাকিম সুস্পষ্ট করে বলেছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

"যদি তোমরা সে অবস্থা দেখতে যখন ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবয করেছিল এবং তাদের মুখমণ্ডলে এবং পার্শ্বদেশে আঘাত করেছিল এবং বলেছিল "নাও, এখন আগুনে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার স্বাদ গ্রহণ কর।"

–(সূরা আনফাল ঃ ৫০)

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○

"ঐসব খোদাভিরুদের রূহ পাক পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশতাগণ কবয করেন তখন তাঁদেরকে বলেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনারা যে নেক আমল করেছেন তার জন্যে বেহেশতে প্রবেশ করুন।"

–(সূরা আন নহল ঃ ৩২)

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে পাপী ও পুণ্যবানদের মৃত্যুর পর পরই অর্থাৎ আলমে বরযখে বা কবরে তাদেরকে যথাক্রমে জাহান্নাম এবং বেহেশতে প্রবেশের কথা শুনানো হয়। কেয়ামতের দিনে বিচার শেষে জাহান্নাম অথবা বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে আলমে বরযখে আযাবের মধ্যে কালযাপন করবে পাপীগণ এবং পরম শান্তিতে বাস করবেন নেক বান্দাহগণ। আয়াত দু'টি তাই কবরে পাপীদের জন্যে আযাব এবং পুণ্যবানদের জন্যে সুখ-শান্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হাদীসে আছে যে, কবর কারো জন্যে বেহেশতের বাগানের ন্যায় এবং কারো জন্যে জাহান্নামের গর্ত বিশেষের ন্যায়। যারা পাপাচারী তাদের শাস্তি শুরু হয় মৃত্যুর পর থেকেই। একটা সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ রেখে তাদেরকে নানানভাবে শাস্তি দেয়া হয়। জাহান্নামের উত্তপ্ত বায়ু অগ্নিশিখা তাদেরকে স্পর্শ করে। বিভিন্ন বিষাক্ত সর্প, বিচ্ছু তাদেরকে দিবারাত দংশন করতে থাকে। কুরআন পাক বলে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

"যদি তোমরা সে অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতাগণ (যুদ্ধে নিহত) কাফেরদের জান কবয করছিল। তারা তাদের মুখমণ্ডলের ও দেহের

নিম্নভাগের উপর আঘাতের উপর আঘাত করে বলছিল, 'এখন আগুনে জ্বলে যাওয়ার মজা ভোগ কর।"-(সূরা আনফাল ঃ ৫০)

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ص فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

"যেসব (কাফের) তাদের নফসের উপর জুলুম করার পর (জান কবযের মাধ্যমে) ফেরেশতাদের দ্বারা গ্রেফতার হয়, তারা হঠকারিতা পরিহার করে আত্মসমর্পণ করে এবং বলে, 'আমরা তো কোন অপরাধ করছিলাম না।' ফেরেশতাগণ জবাবে বলে, 'হ্যাঁ তাই বটে। তোমরা যা করছিলে তা আল্লাহ ভালোভাবে জানেন। যাও এখন জাহান্নামের দরজায় ঢুকে পড়। সেখানেই তোমাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে।' অতএব, সত্য কথা এই যে, গর্ব-অহংকারীদের জন্যে অতি নিকৃষ্ট বাসস্থান রয়েছে।"

-(সূরা আন নাহল ঃ ২৮)

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

"তারপর সে সময়ে কি অবস্থা হবে—যখন ফেরেশতাগণ এদের রূহ কবয করবে এবং তাদের মুখে ও পিঠে মারতে থাকবে? এসব তো এ জন্যেই হবে যে তারা এমন পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছিল—যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছিল এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার পথ অবলম্বন করা তারা পছন্দ করেনি। এজন্যে তিনি তাদের সকল আমল বিনষ্ট করে দিয়েছেন।"

—(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২৭-২৮)

মৃত্যুর পর পাপীদের আত্মাগুলোকে আলমে বরযখের নির্দিষ্ট সংকীর্ণ স্থানগুলোতে রাখা হবে এবং সেখানে তাদেরকে নানানভাবে শাস্তি দেয়া হবে। আলমে বরযখে দেহ থাকবে না, থাকবে শুধু রূহ বা আত্মা এবং তার সুখ-দুঃখের পূর্ণ অনুভূতি থাকবে। পাপীদের অবস্থা হবে হাজতবাসী আসামীদের ন্যায়।

অপরদিকে যারা খোদাভীরু ও পুণ্যবান—তাদের অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বলতে গেলে আল্লাহ তায়ালার মেহমান হবেন এবং তাঁদের বাসস্থান হবে বহুগুণে আরামদায়ক।

তার মধ্যে থাকবে সুখ-শান্তিদায়িনী বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী। তাই বলা হয়েছে — সেটা হবে বেহেশতের একটি বাগানের ন্যায়।

মুমেন ও মুত্তাকীকে মৃত্যুর সময় এ স্থানের সুসংবাদ দেয়া হবে।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

"যারা বললো, আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তারপর একথার উপর তারা অবিচল থাকলো, তাদের কাছে অবশ্যই ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলে, 'ভয় করো না, দুঃখ করো না, সেই বেহেশতের সুসংবাদ শুনে খুশী হও যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে।"-(সূরা হামীম আস সাজদা ঃ ৩০)

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ص فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ط بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

"ঐসব কাফেরদের জন্য (দুর্ভাগ্য) যারা তাদের নিজেদের উপর জুলুম করে। যখন ফেরেশতারা তাদের জান কবয করে তাদের গ্রেফতার করে নেয়, তখন তারা সংগে সংগেই নতি স্বীকার করে বলে, আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। ফেরেশতাগণ জবাবে বলবে, অপরাধ করনি কেমন ? তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ তো আল্লাহ্ তায়ালা ভালোভাবে অবগত আছেন।"-(সূরা আন নহল ঃ ২৮)

নবী (সা) বলেন ঃ

قال الله تعالى اعددت لعبادى الصالحون مالا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. (بخارى مسلم)

নবী (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি আমার নেক বান্দাদের জন্যে কবরে এমন অনেক কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছি যা কোন চক্ষু কোন দিন দেখেনি। কোন কান তা শুনেনি এবং তা মানুষের কল্পনারও অতীত।

পাপীদের কবরে শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

أَلْهَٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য ও প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ক্ষমতা গর্বিত করে রাখে যার ফলে তোমরা খোদাকে ভুলে যাও। অতপর হঠাৎ এক সময় তোমরা মৃত্যুবরণ করে কবরে গিয়ে হাজির হও। তোমরা কি মনে করেছ যে, তারপর আর কিছুই নেই ? তা কখনো মনে করো না। শীঘ্রই তোমরা প্রকৃত ব্যাপার জানতে পারবে। সে সময়ের অবস্থা যদি তোমাদের নিশ্চিতরূপে জানা থাকতো তাহলে তোমাদের এ ভুল ভেঙে যেতো। কবরে যাবার পর তোমরা অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। যে জাহান্নাম তোমরা বিশ্বাস করতে চাওনি তার সম্পর্কে সে দিন তোমাদের চাক্ষুষ বিশ্বাস জন্মাবে। অতপর এ দুনিয়ার বুকে তোমরা যে আমার অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করেছ, সে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"−(সূরা তাকাসুর ঃ ১-৮)

কুরআন পাকের উপরোক্ত ঘোষণার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হাদীসে পাওয়া যায়। বুখারী এবং মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রা) একটি বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ

নবী বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পর (কবরে গিয়ে পৌঁছলে) তাকে প্রতি সকাল সন্ধ্যায় তার ভবিষৎ বাসস্থান দেখানো হয়। সে যদি বেহেশতবাসী হয় তো বেহেশতের স্থান এবং জাহান্নামবাসী হলে জাহান্নামের স্থান। অতপর তাকে বলা হয়, "এটাই তোমার আসল বাসস্থান।"

নবী বলেন, অতপর আল্লাহ তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন।

"যখন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং যখন তার সংগী-সাথীগণ তাকে দাফন করার পর প্রত্যাবর্তন করতে থাকে, যাদের চলার পদধ্বনী সে তখনো শুনতে পায় তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হন দু'জন ফেরেশতা। তাঁরা মুর্দাকে বসাবেন। অতপর তাঁরা নবী মুস্তফার (সা) প্রতি ইশারা করে বলবেন দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি ধারণা রাখতে ?"

সে ব্যক্তি মুমেন হলে জবাব দেবে যে উনি আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূল।

তখন তাকে বলা হবে, "এই দেখ জাহান্নামে তোমার জন্যে কিরূপ জঘন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ তোমার এ স্থানকে বেহেশতের স্থানের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখবে।"

কিন্তু কাফেরকে উক্ত প্রশ্ন করলে তার জবাবে সে বলবে, "আমি তা বলতে পারি না। মানুষ যা বলতো, আমিও তাই বলতাম।"

তাকে বলা হবে, "তুমি তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করনি এবং আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ পড়েও জানতে চাওনি।"

অতপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে কঠোরভাবে আঘাত করা হবে। সে অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করতে থাকবে। সে চীৎকার আর্তনাদ ভূ-পৃষ্ঠে জ্বিন ও মানুষ ব্যতীত আর সকল জীব শুনতে পাবে।

উক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের নাম বলা হয়েছে মুনকির ও নাকির।

কবর আযাদের বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কবর আযাব এক অনিবার্য সত্য। তাই সকল মুসলমানের উচিত কবর আযাব থেকে পরিত্রাণের জন্যে সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে কাতর প্রার্থনা করা এবং প্রকৃত মুসলমানের মতো জীবনযাপন করা।

হযরত যায়েদ বিন সাবেত বলেন ঃ

"একদা রসূলুল্লাহ (সা) বনি নাজ্জার গোত্রের প্রাচীর ঘেরা একটি বাগানে খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। আমরাও ছিলাম তাঁর সাথে। হঠাৎ খচ্চরটি লাফ মেরে উঠতেই হুযুর (সা) মাটিতে পড়ার উপক্রম হয়েছিলেন। দেখা গেল সেখানে পাঁচ-ছয়টি কবর রয়েছে। নবী বললেন, "তোমরা কি কেউ এ কবরবাসীদের চেন ?"

আমাদের মধ্যে একজন বললো, 'আমি চিনি।'

নবী (সা) বললেন, 'এরা কবে মরেছে।'

সে বললো, 'এরা মরেছে শির্কের যমানায়।'

নবী বললেন, 'এ উম্মত তথা মানবজাতি কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং শাস্তি ভোগ করে। যদি আমার এ ভয় না হতো যে তোমরা মানুষকে কবর দেয়া বন্ধ করে দেবে তাহলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনতে যা আমি শুনতে পাচ্ছি।'

অতপর নবী (সা) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমরা সকলে জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রর্থনা কর।"

সকলে সমস্বরে বললো, "আমরা জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।"

নবী (সা) বললেন, "তোমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও।"

সকলে বললো, "আমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।"

নবী (সা) বললেন, "তোমরা সকল গোপন ও প্রকাশ্য ফেৎনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও।"

সকলে বললো, "আমরা সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য ফেৎনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।"

নবী (সা) বললেন, "এবার তোমরা দাজ্জালের ফেৎনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও।"

সকলে বললো, "আমরা দাজ্জালের ফেৎনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।"
—(মুসলিম)

প্রকাশ থাকে যে, নামায শেষে সালাম ফেরার পূর্বে নবীর (সা) শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী উক্ত দোয়াটি করা হয়।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার কবর যিয়ারত করা ইসলামে জায়েয আছে। কবরের পাশে গিয়ে কবরবাসীকে সালাম করে তার জন্য দোয়া করা—এ হচ্ছে ইসলাম সম্মত নীতি। অবশ্য মুসলিম সমাজে কবর পূজা এবং মৃত ব্যক্তির কাছে কোন কিছু চাওয়ার শির্ক চালু আছে। ঈমান বাঁচাবার জন্যে এর থেকে দূরে থাকতে হবে।

মৃত ব্যক্তির আত্মা সম্পর্কেও কিছু কিছু ভ্রান্ত এবং মুশরেকী ধারণা মুসলমান সমাজে কারো কারো মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের ধারণা আত্মা মৃত্যুর পরেও এ দুনিয়ায় যাতায়াত ও ঘোরাফেরা করে। তাদের অনেক অসীম ক্ষমতাও থাকে বলে তাদের বিশ্বাস। আসলে এসব ধারণা করা যে শির্ক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে এসব কল্পিত আত্মার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদের নামে নযর-নিয়ায পেশ করে। আলমে বরযখ থেকে এ স্থূল জগতে আত্মার ফিরে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তবে মৃত ব্যক্তিকে সালাম করলে সে সালাম আল্লাহ তার বিচিত্র কুদরতে আলমে বরযখে সে ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দেন। অনেকে বলেন, সালামকারীকে মৃত ব্যক্তি দেখতেও পায় এবং চিনতে পারে। এ কেমন করে সম্ভব বেতার ও টেলিভিশনের যুগে সে প্রশ্ন অবান্তর।

মহাপ্রলয় বা ধ্বংস

জগতে যা কিছু হচ্ছে সবই আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অধীন। সৃষ্টিজগতের ধ্বংস, নতুন জগত সৃষ্টি ও মানুষের পুনর্জীবন লাভ সবই তাঁর মহান পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অধীন।

মহাপ্রলয় শুরু করার জন্যে ফেরেশতা হযরত ইসরাফিল (আ) খোদার আদেশের প্রতীক্ষায় আছেন। আদেশ মাত্রই তিনি তাঁর সিংগায় ফুঁক দেবেন। এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে যে, তিনি এক মহাশক্তিশালী সাইরেন বাজাবেন।

মহাপ্রলয় শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত ইসরাফিল (আ) সিংগায় ফুঁক দেবেন। অর্থাৎ এক প্রকার বংশীধ্বনী করবেন। এ বংশীকে কুরআনে صور সূর নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইংরেজীতে যেমন—BUGLE বলা হয়। সে বংশীধ্বনী ও তাণ্ডবলীলার পূর্বাভাস। সে বংশী এবং তার ধ্বনী আমাদের কল্পনার অতীত এবং ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। একটি উদাহরণসহ বুঝবার চেষ্টা করা যাক। বর্তমান কালে সাইরেন ধ্বনী যেমন একটা আশু বিপদ ও ধ্বংসের সংকেত দান করে, বিশেষ করে যুদ্ধকালীন সাইরেন—তেমনি 'সূর' বা সিংগা চরম ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্তে এক আতংক ও বিভীষিকা সৃষ্টিকারী ধ্বংস করতে থাকবে। সহজে বুঝাবার জন্যে এখানে সাইরেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে।

শিংগা থেকে প্রচণ্ড বেগে খট্‌খট্‌ শব্দ হবে এবং তা তৎসহ একটানা ধ্বনীও হবে। সে শিংগা বা সাইরেন থেকে এমন বিকট, ভয়ংকর ও রোমাঞ্চকর ধ্বনী হতে থাকবে যে কর্ণকুহর বিদীর্ণ হবে। প্রত্যেকেই এ ধ্বনী তার নিকটস্থ স্থান থেকে সমভাবে শুনতে পাবে। প্রত্যেকের মনে হবে যেন তার পার্শ্ব থেকেই সে ধ্বনী উত্থিত হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, ফেরেশতা একই স্থান থেকে তাঁর শিংগা বা সাইরেন ধ্বনী করবেন। কিন্তু সমগ্র জগতব্যাপী মানুষের নিকটবর্তী স্থানে মাইক্রোফোনের হর্ণের ন্যায় কোন অদৃশ্য যন্ত্র স্থাপন করা হবে।

হাদীসে এ صور সূরকে (শিংগা) তিন প্রকার বলা হয়েছে। যথা ঃ

১। نَفْخَةُ الْفَزَاعِ (নাফখাতুল ফিযা) অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত করার শিংগা ধ্বনী।

২। نَفْخَةُ الصَّعْقِ (নাফকাতুয সায়েক) অর্থাৎ পড়ে মরে যাওয়ার বা মরে পড়ে যাওয়ার শিংগা ধ্বনী।

৩। نَفْخَةُ الْقِيَامِ (নাফখাতুল কিয়াম) অর্থাৎ কবর থেকে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে সকলকে একত্র করার শিংগা ধ্বনী।

অর্থাৎ প্রথম শিংগা ধ্বনীর পর এমন এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিশৃংখলা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে যে, মানুষ ও জীবজন্তু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পাগলের মতো এদিক সেদিক ছুটোছুটি করবে।

দ্বিতীয়বার শিংগা ধ্বনীর সাথে সাথেই যে যেখানেই থাকবে তৎক্ষণাৎ মরে ধরাশায়ী হবে। তারপর এক দীর্ঘ ব্যবধানে—তা সে কয়েক বছর এবং কয়েক যুগও হতে পারে অথবা অল্প সময়ও হতে পারে—তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ের মতো শিংগা ধ্বনী হবে। আর সংগে সংগেই তার মৃত্যুর স্থান অথবা কবর থেকে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ○ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ○ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

"(তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও) যেদিন যমীন আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ করে দেয়া হবে। তারপর সকলেই মহাপরাক্রান্তশালী এক আল্লাহর সামনে হাতে পায়ে শিকল পরা এবং আরামহীন অবস্থায় হাজির হয়ে যাবে। সেদিন তোমরা পাপীদেরকে দেখবে আলকাতরার পোশাক পরিধান করে আছে। আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখমণ্ডলের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটা এজন্য হবে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। আল্লাহর হিসাব নিতে বিলম্ব হয় না।"

–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮-৫১)

এ আয়াত থেকে এবং কুরআনের অন্যান্য ইশারা-ইংগিত থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতে যমীন আসমানকে অস্তিত্বহীন করে দেয়া হবে না। বরঞ্চ বর্তমানের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটানো হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিংগাধ্বনীর মধ্যবর্তী কালের এক বিশেষ সময়ে (যা শুধু আল্লাহ তায়ালাই জানেন) যমীন আসমানের বর্তমান আকার আকৃতি পরিবর্তন করে অন্যরূপ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক আইন পদ্ধতিসহ তা নতুন করে তৈরী করা হবে। এটাই হবে আলমে আখেরাত বা পরকাল-পরজগত। তারপর শেষ শিংগাধ্বনীর সাথে সাথে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যতো

মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে তারা সব নতুন করে জীবিত হবে এবং আল্লাহ তায়ালার সামনে হাজির হবে। কুরআনের পরিভাষায় একেই বলে হাশর। তার আভিধানিক অর্থ হলো চারদিক থেকে গুছিয়ে একস্থানে একত্র করা।

–(তাফহীমুল কুরআন)

কুরআন পাকে ধ্বংসের যে ধারাবাহিক বিবরণ দেয়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, সে সময়ে (প্রথম অবস্থায়) সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। আকাশ বিদীর্ণ হবে। নক্ষত্ররাজি স্খলিত হয়ে নিম্নে পতিত হবে। সমস্ত জগতব্যাপী এক প্রলয়ংকর ভূমিকম্প হবে। পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণার ন্যায় উড়তে থাকবে। সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে স্থলভাগ প্লাবিত করে ফেলবে। মোটকথা সবকিছুই তসনস ও লণ্ডভণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। জগত আকাশমণ্ডলী ও সৃষ্টি বলতে কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। এমন কি কোন ফেরেশতারও অস্তিত্ব থাকবে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তাই বিদ্যমান থাকবে।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَاظُلْمَ الْيَوْمَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

"(সেদিন চীৎকার করে জিজ্ঞেস করা হবে) আজ বাদশাহী কার? (দুনিয়ার ক্ষমতাগর্বিত শাসকগণ আজ কোথায়?) (এ ধ্বনি বা জবাবই উত্থিত হবে) আজ বাদশাহী কর্তৃত্ব প্রভুত্ব একমাত্র পরম পরাক্রান্তশালী আল্লাহর। (বলা হবে) আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে—তার বদলা দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। আর আল্লাহ হিসাব নেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষিপ্র।"–(সূরা মুমেন ঃ ১৬-১৭)

এখন প্রশ্ন মানুষের পার্থিব জীবনের হিসাব-নিকাশ গ্রহণের। এতো অগণিত মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ কি সহজ কথা? কিন্তু আল্লাহর নিকটে সবইতো অতি সহজ।

আল্লাহ বলেন যে, তিনি যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তখন সৃষ্টি করার পর তার কাজ শেষ হয়ে যায়নি। তিনি মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য রাখেন। এমন কি তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যে চিন্তাধারার উদয় হয়—তাও তাঁর জানা আছে।

আল্লাহ একথাও বলেন যে, তিনি মানুষের গলদেশের শিরা থেকেও নিকটে অবস্থান করেন। খোদার অসীম জ্ঞান তাকে পরিপূর্ণ পরিবেষ্টন করে আছে। তার প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে আল্লাহকে কোথাও গমন করার

প্রয়োজন হয় না। মানুষের প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য ক্রিয়াকর্ম তাঁর নিখুঁতভাবেই জানা থাকে। এ সম্পর্কে তার সরাসরি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি সৃষ্টিজগতের শাহানশাহ হিসেবে তাঁর অসংখ্য অফিসার নিযুক্ত করে রেখেছেন, মানুষের প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করার জন্যে। প্রত্যেক মানব সন্তানের জন্যে দু'জন করে ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। একজন ডান দিকে, অপরজন বাম দিকে। তার মুখ থেকে কোন কথা উচ্চারিত হবার সংগেই তার লিপিবদ্ধ করার জন্যে তাঁরা সদা সচেতন থাকেন। এমনিভাবে ফেরেশতাদ্বয় মানুষের প্রতিটি কাজের সঠিক ও পুংখ্যানুপুংখ রেকর্ড তৈরী করে যাচ্ছেন। এ রেকর্ড অথবা দলিল দস্তাবিজ প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হবে বিচার দিনে যা অস্বীকার করার কোনই উপায় থাকবে না।

মানুষের প্রতিদিনের কাজের এই যে, নিখুঁত রেকর্ড এর সঠিক ধারণা করা বড়ই কঠিন। কিন্তু আজ পর্যন্ত যেসব তথ্য আমাদের কাছে উদঘাটিত হয়েছে, তা থেকে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মানুষ যে পরিবেশ থেকে তার দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যাচ্ছে সেই পরিবেশের আনাচে-কানাচে রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার কাজকর্ম কথা-বার্তা, হাসি-কান্না, চলা-ফেরা, ভাব-ভংগী, কণ্ঠস্বর প্রভৃতির অবিকল চিত্র অংকিত হয়ে যাচ্ছে। এসব কিছুতেই পুনর্বার এমনভাবে দৃশ্যমান করে তোলা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। মানুষ তার সীমিত জ্ঞান ও সীমিত শক্তি বিশিষ্ট যন্ত্র দ্বারা এর কিছুটা আয়ত্ত করতে পেরেছে। কিন্তু আল্লাহর নিয়োজিত অফিসারবৃন্দের (ফেরেশতা) এসব যন্ত্রেরও কোন প্রয়োজন নেই এবং তাদের কাজের কোন বাধা-বন্ধনও নেই। মানুষের শরীর এবং তার চতুস্পার্শস্থ প্রতিটি বস্তুই তাঁদের টেপ (Tape) এবং ফিল্ম (Film) যার উপর তাঁরা প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি চিত্র অবিকল অংকিত করতে পারেন। অতপর তাঁরা বিচার দিবসে মানুষকে তার আপন কানে সেসব কিছুই শুনাতে পারেন, যা তারা নিজেরা বলেছে, এবং সেসব কিছুই তাদেরকে আপন চোখে দেখাতে পারেন যা তারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে করেছে। এরপর এ অস্বীকার করা তার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব হবে না।

দুনিয়ার জীবনে হঠাৎ এক সময় মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় মানুষের দুয়ারে। আত্মা দেহচ্যুত করে মৃত্যু সংঘটিত করার জন্যে নির্দিষ্ট ফেরেশতা আছেন। তাঁর নাম হযরত আজরাইল (আ)। তাঁকে 'মালেকুল মওত'ও বলে (মৃত্যুর রাজা বা যমরাজ) মৃত্যুর সময় অসহ্য যন্ত্রণাও হয়। আল্লাহ বলেন যে মৃত্যুকে মানুষ সবসময় এড়িয়ে চলতে চায় সে যখন অনিবার্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন সে ব্যক্তির কাছে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। এতদিন এ দুনিয়া এবং পরকালের মাঝে এক দুর্ভেদ্য যবনিকা বিরাজ করতো।

মৃত্যুর সময় সে যবনিকা উত্তোলন করা হবে। তখন সে সুস্পষ্টরূপে পরকাল দেখতে পাবে যার সম্বন্ধে আল্লাহর নবীগণ সর্বদা সতর্কবাণী ঘোষণা করেছেন। পরকালের সত্যতাই শুধু তার কাছে প্রতিভাত হবে না, বরঞ্চ সে এটাও জানতে পারবে সে ভাগ্যবান হিসবে পরকালের যাত্রা শুরু করছে, না ভাগ্যহীন হিসেবে।

পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তি এসব কিছুই তার দুনিয়ার জীবনে অসত্য এবং কাল্পনিক বলে বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন তার সেই তথাকথিত কাল্পনিক পরকাল তার চোখের সামনে সুস্পষ্ট।

এমনি করেই প্রতিটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। অতপর যখন মহাপ্রলয়ের পর সাইরেন ধ্বনী হবে পুনরুত্থানের জন্যে, তখন প্রতিটি মানুষ বিচারের ময়দানে হাজির হবে। তার সংগে থাকবেন দু'জন ফেরেশতা। একজনের কাজ হবে পুনরুত্থানের স্থান থেকে খোদার দরবার পর্যন্ত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং অপরজন হবেন তার রেকর্ডবহনকারী ও সাক্ষ্যদাতা। সম্ভবত এ ফেরেশতাদ্বয়ই দুনিয়ার জীবনে মানুষের কৃতকর্ম রেকর্ড করার কাজে নিয়োজিত। সাইরেন ধ্বনীর সংগে মানুষ যখন তার কবর অথবা মৃত্যুর স্থান থেকে জীবিত হয়ে উঠবে তখন এই ফেরেশতাদ্বয় তাকে তাদের হেফাজতে (Custody) নিয়ে খোদার সমীপে হাজির করেন, যেমন আসামীকে পুলিশ কোর্টে হাজির করে।

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ○

"সেদিন খোদা প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে বলবেন, "এদিনের প্রতি অবিশ্বাস করে তুমি অবহেলায় জীবন কাটিয়েছ। আজ তোমার চোখের আবরণ আমি অপসারিত করে দিয়েছি। যা তুমি বিশ্বাস করতে চাওনি, অন্তরের চক্ষু দিয়ে তুমি দেখতে চাওনি, তা আজ প্রত্যক্ষ কর। এ সত্য দেখার জন্যে আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দিয়েছি।"-(সূরা ক্বাফ ঃ ২২)

ফেরেশতাদ্বয় তাঁদের যিম্মায় গৃহীত ব্যক্তিকে খোদার দরবারে হাজির করবেন। হাজির করার দায়িত্ব যার উপরে তিনি বলবেন ঃ

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ○ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ○

"হে খোদা আমার দায়িত্বে যাকে দেয়া হয়েছিল, এই যে তাকে হাজির করেছি। (বিচারের পর হুকুম হবে) সত্যের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী প্রত্যেক কট্টর কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।"

-(সূরা কাফ ঃ ২৩-২৪)

জাহান্নামবাসীর প্রধান প্রধান অপরাধ

أَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ۝ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيْبٍ ۝

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ۝

"প্রত্যেক কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর যে সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, মংগল বা সৎপথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, সীমালংঘনকারী এবং দ্বীনের প্রতি সন্দেহপোষণকারী।"-(সূরা কাফ ঃ ২৪-২৬)

উপরোক্ত আয়াত দু'টির বিশ্লেষণ করলে জাহান্নামবাসীর যে প্রধান অপরাধগুলো ছিল তা নিম্নরূপ ঃ

০ নবীগণ কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে অস্বীকার।

০ সত্য ও সত্যের দিকে আহ্বানকারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ।

০ জীবনের প্রতি মুহূর্তে খোদার অনুগ্রহ ও দান লাভ করে তাঁর অকৃতজ্ঞ হওয়া।

০ সৎপথের প্রতিবন্ধকতা করা ও সৎপথ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করা।

০ আপন ধন-সম্পদ থেকে খোদা ও মানুষের হক আদায় না করা।

০ জীবনে খোদা কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করা।

০ অন্যের প্রতি অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার করা।

০ নবী কর্তৃক প্রচারিত দ্বীনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা।

০ অপরের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা।

০ খোদার সংগে অন্যকে অংশীদার করা।

শয়তান ও মানুষের মধ্যে কলহ

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়াতে শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে হর-হামেশায় লিপ্ত আছে। পরকালে জাহান্নামের শাস্তি প্রদত্ত ব্যক্তির সাথে তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হবে। সে সময়ে সে ব্যক্তি এবং শয়তান উভয়ে একে অপরের প্রতি দোষারূপ করতে থাকবে। হতভাগ্য লোকটি শয়তানের প্রতি এই বলে দোষারূপ করবে যে, একমাত্র তারই প্ররোচনায় সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব এ শাস্তি একমাত্র তারই প্রাপ্য।

অপর দিকে শয়তান তার নিজের ত্রুটি স্বীকার না করে লোকটিকেই দোষী বলবে। সে খোদার দরবারে তার সাফাই পেশ করে বলবে ঃ

رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○

"হে প্রভু পরোয়ারদেগার ! আমি তাকে পথভ্রষ্ট করতে মোটেই চেষ্টা করিনি। বরঞ্চ সে নিজেই ছিল পথভ্রষ্ট।"

আল্লাহ উভয়কে সম্বোধন করে বলবেন—"আমার সামনে তোমরা এভাবে কলহ করো না। এতে কোন লাভ নেই। কারণ তোমাদের উভয়কেই আমি পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে বলেছিলাম যে, যে ব্যক্তি নিজে পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও করবে, তাদের উভয়কেই তার পরিণাম ভোগ করতে হবে। এখন উভয়েই এ অনিবার্য শাস্তি ভোগ কর। আমার সিদ্ধান্ত অটল ও অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। তোমাদের প্রতি যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা পরিবর্তন করা হবে না। পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী উভয়কেই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে দুনিয়াতে আমার যে অটল আইন ঘোষণা করা হয়েছিল, তার কোন পরিবর্তন করা হবে না। এতদসত্ত্বেও আমি কিন্তু আমার বান্দাহর উপরে কণামাত্র অবিচার করি না। আজ তোমাদের প্রতি যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, তোমরা তার প্রকৃতই উপযুক্ত। আমার বিচার ব্যবস্থা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাউকে এমন কোন শাস্তি দেয়া হয় না যার জন্যে সে সত্যিকারভাবে দায়ী নয়। অথবা যার অপরাধ অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

–(সূরা কাফ ঃ ২৭-২৯ দ্রষ্টব্য)

জান্নাতবাসীর সাফল্যের কারণ

অপর দিকে যাঁরা খোদাভীরু, যাঁরা নবীদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, নবীদের কথার উপর দ্বিধাহীনচিত্তে পরিপূর্ণ ঈমান এনেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন যে, বেহেশত তাঁদের অতি নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। যেহেতু এ বেহেশতই হবে তাঁদের চিরন্তন বাসস্থান, সে জন্যে তাঁদের সপক্ষে রায় ঘোষণার সংগে সংগেই বেহেশত তাঁদের অতি সন্নিকটে করে দেয়া হবে। কষ্ট করে পায়ে হেঁটে অথবা কোন যানবাহনের মাধ্যমে বেহেশতে পৌঁছার প্রয়োজন হবে না। রায় ঘোষিত হবার পর মুহূর্তেই তাঁরা অনায়াসে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

মোটামুটি কোন্ গুণাবলীর জন্যে তাঁরা বেহেশত লাভ করবে, তার উল্লেখও আল্লাহ্ করেছেন।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ - هٰذَا مَاتُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ○

"এবং জান্নাত মুত্তাকীদের নিকটে আনা হবে, তা একটুও দূরে হবে না। বলা হবে—এটা ঐ জিনিস যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছিল —প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যে যে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী।"–(সূরা কাফ ঃ ৩১-৩২)

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ○

"যে না দেখেই রহমানকে ভয় করে। যে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট থাকে।"–(সূরা কাফ ঃ ৩৩)

০ তাঁদের প্রথম গুণ হবে খোদাভীতি (তাকওয়া)। দুনিয়ার জীবনে খোদার অসন্তুষ্টির ভয়ে তাঁরা থাকবেন সদাভীত সন্ত্রস্ত। এ খোদাভীতিই তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে অবিচলিত রাখবে সৎপথে।

০ তাঁদেরকে কুরআনের ভাষায় 'আওয়াব' বলে তাঁদের দ্বিতীয় গুণের কথা বলা হয়েছে। 'আওয়াব' (أَوَّابٍ) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। 'আওয়াব' বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি আল্লাহ্র নাফরমানী এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি এমন সবকিছুই পরিত্যাগ করেছেন, যা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন এবং এমন সবকিছু অবলম্বন করেছেন যা আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি খোদার পথ থেকে হঠাৎ বিচ্যুত হয়ে পড়লে অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সংগে সংগেই

তওবা করে খোদার পথে ফিরে আসেন। যিনি সর্বদা আল্লাহকে ইয়াদ করেন এবং আল্লাহর নীতি অনুযায়ী সবকিছুর সিদ্ধান্ত করেন।

০ তৃতীয় গুণের কথা বলতে গিয়ে তাঁদেরকে বলা হয়েছে 'হাফীয' (حفيظ) যার সাধারণ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন রক্ষণাবেক্ষণকারী যিনি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, আল্লাহর ফরয ও হারামসমূহ এবং অর্পিত অন্যান্য আমানত ও দায়িত্বের পুরাপুরি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি ঐসব হকের রক্ষণাবেক্ষণ করেন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর চাপানো হয়েছে। তিনি ঐসব শপথ ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেন, যা তিনি ঈমান আনার সাথে সাথে আল্লাহর সংগে করেছেন। যিনি আপন সময় শক্তি, শ্রম ও চেষ্টা চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন যাতে করে তা কোন কুকর্ম ও কুপথে ব্যয়িত না হয়। তিনি তওবা করে তা রক্ষণাবেক্ষণ করেন যেন তা নষ্ট হয়ে না যায়। তিনি প্রতি মুহূর্তে নিজকে যাঁচাই পরীক্ষা (মুহাসাবায়ে নফ্স) করে দেখেন যে তিনি তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা আল্লাহর কোন নাফরমানী করেননি। এমন ব্যক্তিকেই বলা হয়েছে 'হাফীয' এবং এসব গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই হবে জান্নাতের অধিবাসী।

০ যিনি আল্লাহকে কোনদিন দেখেননি, অথচ তাঁর সীমাহীন দয়ার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে তাঁকে সর্বদা ভয় করে চলেন। অনন্ত দয়া ও করুণা অনুকম্পার সাগর আল্লাহকে কখনো দেখা যায় না এবং ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা তাঁকে কোনরূপ অনুভবও করা যায় না। এতদসত্ত্বেও তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে যিনি তাঁর নাফরমানী থেকে সদা বিরত থাকেন। অন্যান্য অনুভূতি শক্তি ও প্রকাশ্যে দৃশ্যমান শক্তিশালী সত্তার চেয়ে অদেখা আল্লাহর ভয় যাঁর অন্তরে অত্যধিক। যিনি আল্লাহকে রহমানুর রহীম বলে বিশ্বাস করলেও তার রহমত ও মাগফেরাতের আশায় পাপে লিপ্ত হন না। বরঞ্চ প্রতিমুহূর্তে যিনি আল্লাহর ভয়ে ভীত সংকিত থাকেন।

আলোচ্য আয়াতের خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ অংশে মুমেনের দু'টি গুণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। প্রথমত এমন আল্লাহকে ভয় করে চলা যাঁকে কোনদিন দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত 'রহমানুর রহীম' হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভয়ে পাপ পথে পদক্ষেপ না করা।

০ যিনি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট থাকেন, আল্লাহ এমন ব্যক্তির মনকে 'কলবে মুনীব' بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ বলে ব্যক্ত করেছেন।

"মুনীব" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কম্পাসের কাঁটা যেমন সকল অবস্থাতেই উত্তরমুখী হয়ে থাকে, শত চেষ্টা করেও যেমন তাকে অন্যদিকে ফিরানো যায় না, ঠিক তেমনি কোন মুমেনের মনকে 'কলবে মুনীব' তখনই

বলা হয় যখন তা সর্বাবস্থায়, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, শয়নে-স্বপনে, জাগরণে একমাত্র আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহমুখী হয়ে থাকে।

আল্লাহর বেহেশতে প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র সেসব ভাগ্যবানই লাভ করবেন, যাঁরা উপরে বর্ণিত পাঁচ প্রকারের গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হবেন।

অতপর মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর, যেখানে না আছে দুঃখ-কষ্ট, আর না আছে কোন কিছুর চিন্তা-ভাবনা। এ এক অনাবিল অফুরন্ত সুখের স্থান। সেখানে আমার ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানানো হবে খোশ আমদেদ।

এ বেহেশত এমন এক স্থান, যেখানে মানুষ তার প্রতিটি বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করবে। উপরন্তু আল্লাহ্ তার জন্যে এমন আরো অমূল্য সম্পদ রেখেছেন যার কল্পনাও সে করতে পারে না।−(সূরা আল ক্বাফ ঃ ৩১-৩৫)

পরকালে বিচার দিবসে মানবজাতিকে তাদের পাপ-পুণ্যের দিক দিয়ে তিন দলে বিভক্ত করা হবে। অগ্রবর্তী দল, দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত দল এবং বাম পার্শ্বে অবস্থিত দল।

বিচার দিনে আল্লাহর মহিমান্বিত দরবারের চিত্র সম্ভবত এমন হবে যে, তাঁর সম্মুখে থাকবে অগ্রবর্তী দল। দক্ষিণ পার্শ্বে একদল এবং বামপার্শ্বে আর একদল। শেষোক্ত দলটি বড়ই হতভাগ্য দল।

সূরায়ে ওয়াকেয়ায় এসবের বর্ণনা নিম্নরূপ দেয়া হয়েছে ঃ

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ○ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ○ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ○
وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَا اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ○ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ○
اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ○ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ○ وَقَلِيْلٌ
مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ○ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ○ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ○
يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ○ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ○ وَكَاْسٍ مِّنْ
مَّعِيْنٍ ○ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ○ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ○
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ○ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ○ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ
جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ○ اِلَّا
قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ○

"সেদিন তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত একটি দল। এ দলটির কথা কি বলব ? বামপার্শ্বে অবস্থিত আর একদল। এ দলটির (দুর্ভাগ্যের কথা) কি বলা যায় ? আর একটি দল হলো অগ্রবর্তী দল। এটি হলো আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ বেহেশত। এ দলে থাকবে প্রাথমিক যুগের অনেক আর পরবর্তী যুগের অল্প সংখ্যক। তারা বালিশে ঠেস দিয়ে পরস্পর মুখোমুখী বসবে কিংখাপখচিত সিংহাসনে। তাদের আশে পাশে চিরকিশোরের দল ঘুরে ফিরে আনন্দ পরিবেশন করবে। তাদের হাতে থাকবে পানির সোরাহী, পানপাত্র ও ঝর্ণা থেকে আনা পরিশুদ্ধ সুরাভরা পেয়ালা। এ সুরা পান করে না মস্তক ঘুর্ণন শুরু হবে, আর না জ্ঞান লোপ পাবে। এবং চিরকিশোরেরা তাদের সামনে পরিবেশন করবে বিভিন্ন উপাদেয় ফলমূল, যেন তার মধ্যে যা খুশী তা তারা গ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে বিভিন্ন পাখীর সুস্বাদু গোশত। খুশী মতো তারা তা খাবে। তাদের জন্যে নির্ধারিত থাকবে সুলোচনা অপরূপ অপসরী। তাদের সৌন্দর্য হবে সযত্নে রক্ষিত মণিমুক্তার ন্যায়। পুণ্যফল হিসেবে এসব কিছু তারা লাভ করবে সে সব সৎকাজের বিনিময়ে যা তারা দুনিয়ায় করেছে। সেখানে তারা শুনতে পাবে না কোন বেহুদা বাজে গালগল্প। অথবা কোন পাপচর্চা অসদালাপ। তাদের কর্থাবার্তা আলাপ-আলোচনা হবে শালীনতাপূর্ণ। থাকবে না তার মধ্যে কোন প্রগলভতা (Insane talks)। তাদেরকে শুধু এই বলে সম্বোধন করা হবে। "আপনাদের প্রতি সালাম সালাম।"-(সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৭-২৬)

অগ্রবর্তী দল

উপরে যে অগ্রবর্তী দলের কথা বলা হলো, সে দলের মধ্যে থাকবেন তাঁরা যাঁরা সততায়, পুণ্যার্জনে এবং সৎপথে চলার ব্যাপারে রয়েছেন সকলের পুরোভাগে। খোদা ও রসূলের (সা) আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন সকলের আগে। জিহাদের হোক, অথবা আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থদানের ব্যাপারে হোক, মানবতার সেবায় হোক অথবা দাওয়াত ও তবলিগের কাজে হোক —মোটকথা দুনিয়াতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উৎখাতের জন্যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের যে কোন সুযোগই আসুক, এ কাজে যাঁরা থাকেন সামনের কাতারে, তাঁরাই অগ্রবর্তীদলের শামিল। এ জন্যে পরকালে শেষ বিচরের দিনে এ দলটিকে রাখা হবে সকলের সামনে। অন্যান্য ধর্মভীরু ও নেক লোকদের স্থান হবে ডানপার্শ্বে। আর হতভাগ্য পাপাত্মাগণ থাকবে বামপার্শ্বে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করিম (সা) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জান কারা কিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম আল্লাহর (কুদরতের) ছায়ায় স্থান গ্রহণ করবে ?"

লোকেরা বললেন, "একথা আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন।"

নবী বললেন, "তারা ঐসব লোক যাদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে সত্যের দাবী করলে তারা তা গ্রহণ করে। তারা অন্যের বেলায় সেরূপ সিদ্ধান্তই করে যা তারা নিজেদের বেলায় করে থাকে।"

উপরে চির কিশোরদের কথা বলা হয়েছে। তারা অনন্তকাল পর্যন্ত এমনি কিশোরই থাকবে। তারা কখনো যৌবনলাভ করবে না অথবা বৃদ্ধ হবে না।

হযরত আলী (রা) এবং হযরত হাসান বস্‌রী (রা) বলেছেন যে, এরা সে সব বালক যারা সাবালক হবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। এদের কোনই পাপপুণ্য ছিল না যার জন্যে তাদের কোন শাস্তি অথবা পুরস্কার হতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত কিশোরেরা এমন সব লোকের সন্তান হবে যাদের ভাগ্যে বেহেশত হয়নি। বেহেশতবাসীদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা রয়েছে যে, তাদের সন্তানদেরকে তাদের সংগে বেহেশতে মিলিত করে দেয়া হবে। শুধু তাদের নিষ্পাপ শিশু সন্তানকেই নয়, বরঞ্চ বয়স্কদের মধ্যে যারা তাদের নেক আমলের দ্বারা বেহেশ্‌ত লাভ করবে, তাদেরকেও পিতা-মাতার সংগে একত্রে বসবাসের সুযোগ দেয়া হবে।"–(সূরা তুর ঃ ২১ দ্রষ্টব্য)

দক্ষিণ পার্শস্থ দল

তারপর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাগ্যবান বেহেশ্‌তবাসীদের প্রসংগে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۙ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۙ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۙ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۙ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۙ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۙ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۙ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۙ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۙ عُرُبًا اَتْرَابًا ۙ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۗ

"এরা লাভ করবে দূর-দূরান্তে বিস্তৃত ছায়াযুক্ত কন্টকহীন কুল ও ফলবাগান আর সদা প্রবাহিত পানির ঝর্ণা ও অফুরন্ত ফলমূল। এসব ফলমূল সকল মৌসুমেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তা লাভ করতে ও তার স্বাদ গ্রহণ করতে থাকবে না কোন বাধা বিপত্তি। তারা হবে উচ্চ আসনে সমাসীন। তাদের স্ত্রীদেরকে আমরা নতুন করে পয়দা করব। তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেব। স্বামীর প্রতি অতিশয় প্রেমানুরাগিণী এবং বয়সে সমান। এসব কিছু দক্ষিণ পার্শ্বস্থ লোকদের জন্যে।"

–(সূরা ওয়াকে'আ ঃ ২৮-৩৮)

বর্ণিত কুমারীগণ ঐসব নারীই হবেন যাঁরা তাঁদের ঈমানদারী ও সৎজীবন যাপনের ফলে বেহেশত লাভ করবেন। আর সেখানে তাঁরা লাভ করবেন নবযৌবন দুনিয়ায় বৃদ্ধা হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও। দুনিয়ায় তাঁরা সুন্দরী থাকুন, আর নাই থাকুন, বেহেশতে তাঁদেরকে বানিয়ে দেয়া হবে অপরূপ সুন্দরী। তাঁরা একাধিক সন্তানের মা হয়ে মরলেও বেহেশতে তাঁরা হবেন চির কুমারী। স্বামী সহবাসের পরও তাঁদের কুমারীত্ব ঘুচবে না কখনো।

এসব ভাগ্যবতী রমণীদের স্বামীগণও যদি বেহেশতবাসী হন, তাহলে তো কথাই নেই। এরা হবেন তাঁদেরই চিরসংগীণী। অন্যথায় তাঁদের নতুনভাবে বিয়ে হবে অন্য বেহেশতবাসীর সংগে।

শামায়েলে তিরমিযিতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একদা এক বৃদ্ধা নবী মুস্তফার (সা) কাছে আরজ করলো, হে আল্লাহর রসূল। আপনি দোয়া করুন যেন আমি বেহেশতে যেতে পারি।

নবী একটু রসিকতা করে বললেন, "কোন বৃদ্ধা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

একথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে গেল।

নবী লোকদেরকে বললেন, "তোমরা তাকে বলে দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ বলেছেন তিনি প্রত্যেক বেহেশতবাসীনীকে কুমারী করে পয়দা করবেন।"

তাবারানীতে হযরত উম্মে সালমার (রা) এক দীর্ঘ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। কুরআনে বর্ণিত উপরোক্ত নারীদের সম্পর্কে নবীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এরা সে সব নারী যারা দুনিয়াতে মৃত্যুবরণ করেছিল। আর তাঁরা ছিল বৃদ্ধা। তাদের চক্ষুদ্বয় ছিল কোঠরাগত। কেশরাজি ছিল পক্ক ও শ্বেত বর্ণের। তাদের এহেন বার্ধক্যের পর আল্লাহ তাদেরকে কুমারী করে পয়দা করবেন।

হযরত উম্মে সালমা (রা) জিজ্ঞেস করেন "পৃথিবীতে কোন নারীর যদি একাধিক স্বামী থাকে, তাহলে বেহেশতে সে কোন্ স্বামীর সংগ লাভ করবে?"

নবী বলেন, "তাকে পূর্ব স্বামীদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার অধিকার দেয়া হবে। সে ঐ স্বামীকেই নির্বাচন করবে, যার স্বভাব-চরিত্র ও আচরণ ছিল সর্বাপেক্ষা উত্তম। সে আল্লাহর কাছে এভাবে আরজ করবে, হে আল্লাহ, যেহেতু অমুকের ব্যবহার ও আচার-আচরণ আমার প্রতি অন্যান্যদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল, তাই আমাকে তারই সংগিনী হবার অধিকার দাও।"

অতপর নবী (সা) বললেন, "উম্মে সালমা, উত্তম চরিত্র ও আচার ব্যবহার এভাবে লুটে নেবে দুনিয়া ও আখেরাতের মংগল।"

বলা বাহুল্য বেহেশতবাসী পুরুষগণও নব যৌবন লাভ করবেন।

তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের বয়স হবে তিরিশের কাছাকাছি। দাড়ি ওঠেনি এমন বয়সের একেবারে নব্য যুবকের মতো। গৌরবর্ণের সুন্দর সুঠাম চেহারা হবে তাদের।

বাম পার্শ্বস্থিত দল

তারপর হতভাগ্য বাম পার্শ্বস্থিত দল জাহান্নামবাসীদের বিষয়ে বলা হয়েছেঃ

فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝ اِنَّهُمْ
كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝
وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝
اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى
مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝ لَاٰكِلُوْنَ
مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ
الْحَمِيْمِ ۝ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝

"এরা অবস্থান করবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি —যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না। এরা ঐসব লোক যারা দুনিয়ার জীবনে ছিল সুখী ও সচ্ছল। তাদের সুখী ও সচ্ছল জীবন তাদেরকে লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে। সেসব পাপ কাজ তারা করতো জিদ্ হঠকারিতা করে। তারা বলতো, "মৃত্যুর পর তো আমরা কংকালে" পরিণত হবো। মিশে যাবো মাটির সাথে। তারপর আবার কি করে আমরা জীবিত হবো ? আমাদের বাপ দাদাকেও কি এভাবে জীবিত করা হবে ? আল্লাহ বলেন, "হে নবী ! তাদেরকে বলে দাও, পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সকলকেই একদিন উপস্থিত করা হবে। তার জন্যে সময় কালও নির্ধারিত আছে। অতপর আল্লাহ বলেন, হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীর দল, তোমরা জাহান্নামে 'যকুম' বৃক্ষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে। তার দ্বারাই তোমরা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তৃষ্ণার্ত উটের মতো তারা পেট ভরে পান করবে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি।"

–(সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৪২-৫৫)

'যকুম' হলো এক প্রকার অতীব কন্টকযুক্ত বিস্বাদ ফল বিশেষ।

জাহান্নামবাসীদের দুর্দশা

কুরআন পাকের বহুস্থানে বেহেশতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে জাহান্নামবাসীদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর বেহেশতবাসীদের পরম সৌভাগ্যের কিছু বিবরণও দেয়া হয়েছে।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

"অবিশ্বাসী কাফেরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের রক্ষক দ্বার খুলে দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের নিকটে কি আল্লাহর রসূলগণ তাঁদের প্রভুর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাননি ? তোমরা যে এ দিনের সম্মুখীন হবে সে সম্পর্কে তারা কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেননি ? প্রত্যুত্তরে তারা বলবে, হ্যাঁ, তাঁরা সবই তো করেছেন। কিন্তু কাফেরদের জন্যে শাস্তির যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা সেদিন পূর্ণ করা হবে। অতপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর। গর্বিত কাফেরদের জন্যে ভয়ানক গর্হিত স্থান এ জাহান্নাম। আর এখানেই তাদেরকে অবস্থান করতে হবে চিরকাল।"

–(সূরা আয যুমার ঃ ৭১-৭২)

জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ط مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝

"কিয়ামতের দিনে আমরা তাদের মস্তক ও মুখমণ্ডল অধঃমুখী করে হাজির করব। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। জাহান্নামের অগ্নির তীব্রতা যদি

হ্রাস পায় আমরা তা বাড়িয়ে দেব। এটা তাদের পরিণাম ফল। তার কারণ, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছিল। তারা বলতো মৃত্যুর পর আমাদের কংকাল মাটিতে মিশে যাবে। তারপর কি করে তা আবার নতুন করে পয়দা হবে?"–(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৯৭-৯৮)

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

"কাফেরদেরকে জাহান্নামের অগ্নিবস্ত্র পরিধান করানো হবে। তাদের মাথার উপরে ঢালা হবে ফুটন্ত গরম পানি। ফলে তাদের চর্ম এবং উদরস্থ বস্তুসমূহ বিগলিত হবে। তাদের জন্যে নির্ধারিত থাকবে লৌহদণ্ড। অসহ্য কষ্টের দরুন যখন তারা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, তখন তাদেরকে পুনরায় তার মধ্যে ঠেলে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে আগুনের স্বাদ গ্রহণ কর।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ১৯-২২)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ج لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ط كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ج رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ط اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ط فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

"কাফেরদের জন্যে জাহান্নামের অগ্নি নির্ধারিত আছে। সেখানে না তাদের মৃত্যু হবে আর না তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে। তারা আর্তনাদ করে বলবে প্রভু আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিন। আমরা পূর্বের মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে এখন থেকে ভালো কাজ করব। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন আমি কি তোমাদেরকে দীর্ঘায়ু দান করেছিলাম না যাতে করে তোমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারতে? (তা যখন করনি) তখন এ শাস্তি ভোগ কর। যালেমদের আজ কোনই সাহায্যকারী নেই।"

–(সূরা আল ফাতির ঃ ৩৬-৩৭)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَزِيزًا حَكِيمًا ○

"যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, শীঘ্রই তাদেরকে আগুনে জ্বালাব। যখন তাদের দেহের চামড়া পুড়ে যাবে, তখন তার জায়গায় নতুন চামড়া পয়দা করব যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। আল্লাহ পরম পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৬)

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ○ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ
فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ لا وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ط أَهْلَكْنَاهُمْ ز إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ○ وَمَا خَلَقْنَا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ○ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ○
يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ○ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
اللَّهُ ط إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ○ طَعَامُ الْأَثِيمِ ○
كَالْمُهْلِ ج يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ○ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ○ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ
إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ○ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ○ ذُقْ ج
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ○ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ○

"এসব লোক বলে, আমাদের প্রথম মৃত্যুর পর আর কিছুই নেই। তারপর আমাদেরকে আর দ্বিতীয়বার পুনরুজ্জীবিত করা হবে না, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের (মৃত) বাপদাদাকে (জীবিত করে) উঠিয়ে আন দেখি। (জবাবে বলা হচ্ছে) এরা কি ভালো, না তুব্বা জাতি এবং তাদের পূর্ববর্তী লোক ? তাদেরকে এ জন্যে ধ্বংস করেছিলাম যে তারা পাপাচারী হয়েছিল। ......এদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে উঠিয়ে নেবার জন্যে নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে ফয়সালার দিন। ঐদিন কোন নিকটতম বন্ধু কোন নিকটতম বন্ধুর কাজে আসবে না। এবং কোথাও থেকে তাদেরকে

সাহায্যও করা হবে না। .....যাক্কুম গাছ পাপীদের খাদ্য হবে। তা তেলের গাদের মতো। তা পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলে উঠবে যেমন উথলে ওঠে ফুটন্ত পানি। (বলা হবে) ধর তাকে এবং হেঁচড়ে টেনে তাকে নিয়ে যাও জাহান্নামের দিকে। উজাড় করে ঢেলে দাও তার মাথার খুলির উপর টগ্‌বগ্‌ করা ফুটন্ত পানির আযাব। উপভোগ কর এ স্বাদ, যেহেতু তুমি ছিলে বড়ো সম্মানিত ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। এ হলো সেই জিনিস যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করছিলে।"-(সূরা আদ দুখান ঃ ৩৪-৫০)

ক্ষমতা মদমত্ত খোদাদ্রোহী শাসক মানুষের প্রভু হয়ে বসেছিল। মনে করতো দুনিয়ার সবচেয়ে প্রতিপত্তিশীল ও সম্মানীত ব্যক্তি। মানুষ স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাকে সিজদা করতো, সর্বদা গুণকীর্তন ও প্রশংসা করতো। আখেরাতের বিচার শেষে তার কি দশা হবে তা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ○

"যেদিন এ কাফেরদেরকে সে আগুনের মুখে এনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদেরকে বলা হবে ; তোমাদের নিজেদের অংশের নিয়ামতসমূহ তোমরা দুনিয়ার জীবনেই শেষ করেছ এবং তার স্বাদও উপভোগ করেছ। দুনিয়াতে তোমাদের কোন অধিকার ছাড়াই তোমরা যেসব অহংকার করেছিলে এবং যেসব নাফরমানী করছিলে, তার প্রতিফল হিসেবে আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাময় আযাব দেয়া হবে।"-(সূরা আহকাফ ঃ ২০)

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ○

"তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতারা তাদের রূহগুলো কব্‌য্‌ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের উপর আঘাত করতে করতে তাদেরকে নিয়ে যাবে ? এটাতো এ কারণেই করা হবে যে, তারা এমন পন্থা-পদ্ধতি ও মতবাদ অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে এবং যে পথ অনুসরণে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যেতো সে পথ অনুসরণ করা পছন্দ করেনি। এ জন্যেই তিনি তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দিয়েছেন।"

-(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২৭-২৮)

উপরের কথাগুলো ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের প্রসংগে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় এসব মুনাফিকরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ইসলাম ও কুফরের সংঘাত-সংঘর্ষের বিপদের ঝুঁকি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর তারা খোদার পাকড়াও থেকে কোথায় পালাবে? সে সময় তাদের শেষ চেষ্টা-তদবীর তাদেরকে ফেরেশতাদের মার থেকে বাঁচাতে পারবে না।

মৃত্যুর পর আলমে বরযখে যে আযাব হবে এ আয়াতটিও তার প্রমাণ। এর থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, মৃত্যুর সময়েই কাফের ও মুনাফিকদের আযাব শুরু হয়ে যায়। অবশ্যি এ আযাব সে আযাবের মতো নয় যা হাশরের মাঠে বিচারের শেষে তাদেরকে দেয়া হবে।

জান্নাতবাসীদের পরম সৌভাগ্য

একদিকে যেমন নবীগণের দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকারকারী, ক্ষমতাগর্বিত খোদাদ্রোহী শাসক ও সমাজপতিদের পরকালীন জীবনের ভয়াবহ পরিণামের বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অপরদিকে সত্যদ্বীনের প্রতি বিশ্বাসী ও খোদার পথে নিবেদিত প্রাণ লোকদের অনন্তকালীন সুখময় জীবনের বিবরণও দেয়া হয়েছে। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○ وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

"দুনিয়ার জীবনে যারা ছিল খোদাভীরু এবং খোদার ভয়ে সংকিত ও অনুগত, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। বেহেশতের রক্ষক তাদেরকে বলবে, আস্সালামু আলাইকুম, আসুন-আসুন, আপনাদের চিরন্তন বাসস্থান বেহেশতে প্রবেশ করুন — পরম সুখে এখানে বসবাস করুন। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি কৃত তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। তিনি এ বেহেশত আমাদের পূর্ণ অধিকারে দিয়ে দিয়েছেন। আমরা যেখানে খুশী বাস করতে পারি। যারা নেক কাজ করে তাদের জন্যে কি সুন্দর পুরস্কার।"

–(সূরা আয যুমার ঃ ৭৩-৭৫)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ ذَوَاتَا اَفْنَانٍ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَاۤئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ط وَجَنَا

الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ هَلْ جَزَاۤءُ
الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ وَمِنْ دُوْنِهِمَا
جَنَّتٰنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ مُدْهَاۤمَّتٰنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ○ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فِيْهِمَا
فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ
حِسَانٌ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ○ فَبِاَيِّ
اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ○

"আর খোদার সামনে পেশ হওয়ার ভয় পোষণ করে এমন প্রত্যেক লোকের জন্যে দু'টি করে বাগান আছে। তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ পুরস্কার তোমরা অস্বীকার করবে ? (সে বাগান) সবুজ-শ্যামল ডাল পালায় ভরপুর।...দু'টি বাগানে দু'টি ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান।... উভয় বাগানে প্রত্যেকটি ফলের দু'টি রকম হবে। ...জান্নাতের লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসবে যার অভ্যন্তর মোটা রেশমের তৈরী হবে। বাগানের বৃক্ষশাখাগুলো ফলভারে নত হয়ে আসবে। সেখানে আরও থাকবে লজ্জায় দৃষ্টি অবনতকারিণী পরমা সুন্দরী। ইতিপূর্বে এদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ অথবা জ্বীন। তারা হবে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী সুরক্ষিত মণি মানিক্যের মতোই। ভালো কাজের পুরস্কার ভালো ছাড়া আর কি হতে পারে ? ... সে দু'টি বাগান ছাড়াও দেয়া হবে আরও দু'টি বাগান।.. ঘনো সবুজ-শ্যামল সতেজ বাগান। ... দু'টি বাগানে দু'টি ঝর্ণাধারা ফোয়ারার মতো উৎক্ষিপ্তমান থাকবে। ... তাতে বেশুমার ফলমূল-খেজুর, আনার প্রভৃতি থাকবে।... (এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে) সতীসাধ্বী সুন্দরী স্ত্রী। .... তাঁবুতে অবস্থানরত হুরপরী। এসব জান্নাতীদেরকে এর আগে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ অথবা জ্বীন। এ

জান্নাতবাসীগণ সবুজ গালীচা এবং সুন্দর ও মূল্যবান চাদরের উপর ঠেস দিয়ে বসবে।"-(সূরা আর রহমান ঃ ৪৬-৭৬)

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلاَ يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

"যারা আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পূরণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না, এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ করেছেন তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠিন হিসাব নিকাশকে এবং যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টিলাভের জন্যে কষ্ট স্বীকার করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তার থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে এবং যারা ভালোর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে, তাদেরই জন্যে আখেরাতের এ আবাসস্থল। অর্থাৎ তাদের জন্যে এমন বাগান হবে যা হবে তাদের চিরন্তন বাসস্থান। তারা নিজেরাও সেখানে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রী-সন্তানাদির মধ্যে যারা নেক হবে তারাও তাদের সাথে উক্ত বাগানে প্রবেশ করবে। চারদিক থেকে ফেরেশতাগণ তাদেরকে খোশ আমদেদ করতে থাকবে এবং বলবে —আস্সালামু আলাইকুম (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তোমরা ধৈর্যের সাথে যেভাবে দুনিয়াতে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছ (ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে) তারই জন্যে আজ তোমরা এ স্থানের যোগ্য হয়েছ। কত সুন্দর আখেরাতের এ বাগান।"-(সূরা আর রাদ ঃ ২০-২৪)

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۝

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ○ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَاۤئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ط وَجَنَا
الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لا
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ○

"কিয়ামতের দিন পাপীদের দেখেই চেনা যাবে। তাদের মাথার অগ্রভাগের কেশরাশি ও পদদ্বয় ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ কুদরত অস্বীকার করবে? এটাই হচ্ছে সেই জাহান্নাম যা তারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারা এর অগ্নিকুন্ড ও উত্তপ্ত ফুটন্ত পানির মধ্যে চলাফেরা করতে থাকবে। ... অপরদিকে খোদাকে যারা ভয় করে তাদের উপভোগের জন্যে বেহেশতে দু'টি বাগান দেয়া হবে। ... শ্যামল তরুলতায় ভরা সে বাগান। ... বাগান দু'টির মধ্য দিয়ে দু'টি ঝরণা প্রবাহিত। ... বাগানের প্রতিটি ফল দু' প্রকারের হবে। ... এ বাগানের মালিক সেখানে মনোরম রেশমী শয্যায় বালিশে ঠেস্ দিয়ে বসবে। বাগানের বৃক্ষ শাখাগুলো ফল ভারে নত হয়ে আসবে। সেখানে আরও থাকবে লজ্জায় দৃষ্টি অবনতকারিণী সুন্দরী। ইতিপূর্বে এদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ অথবা জ্বীন। .... তারা হবে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী সুরক্ষিত মণি-মানিক্যের মতোই।"

–(সূরা আর রহমান ঃ ৪১-৪৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ
بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا
حَكِيْمًا ○

"যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করব। যখন তাদের চর্ম দগ্ধিভূত হবে, তখন তার পরিবর্তে নতুন চর্ম সৃষ্টি করে দেব। যাতে করে তারা শাস্তি ভোগ করতে পারে। আল্লাহ পরম পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৬)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ (توبة : ٢٠-٢٢)

"আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে বড়ো মর্যাদা তো তাদের, যারা তাঁর উপরে ঈমান এনেছে, তাঁরই পথে ঘরদোর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার পরিত্যাগ করেছে এবং মাল ও জান দিয়ে (আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, তাদেরই জীবন সার্থক হয়েছে। তাদের প্রভু (আল্লাহ) তাঁর রহমত, সন্তুষ্টি এবং এমন বাগবাগিচায় বাসস্থানের সুসংবাদ দেন—যেখানে তাদের জন্যে চিরন্তন সুখ-শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে। চিরকাল তারা সেখানে বসবাস করবে। নেক কাজের প্রতিদান দেবার জন্যে তাঁর কাছে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে।"

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ (الصف : ١٠-١٢)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদেরকে কি এমন একটা ব্যবসার কথা বলে দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবে ? আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে মাল ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম কর। যদি জানতে চাও তাহলে শুনে রাখ এই হচ্ছে তোমাদের জন্যে মংগলদায়ক। (কারণ এর ফলে) আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন, বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্ন দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে এবং চিরদিনের বাসস্থান ও বাগানসমূহে তোমাদেরকে দান করবেন সুরম্য আবাসগৃহ। এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে বিরাট সাফল্য।"

কুরআন হাকীমে বহুস্থানে বেহেশতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের এ ধরনের বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপরে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

পরকাল জয় পরাজয়ের দিন

আল্লাহ্ তায়ালা পরকালের বিচার দিবসকে সত্যিকার জয় পরাজয়ের দিন অথবা সাফল্য ও ব্যর্থতার দিন বলে ঘোষণা করেছেন ঃ

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

"কাফেররা বড় গালগর্ব করে বলে থাকে যে, মৃত্যুর পর আর কিছুতেই তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে না। (হে নবী) তাদেরকে বল, "আমার প্রভুর কসম, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পরকালে পুনরুত্থিত করা হবে। অতপর তোমরা দুনিয়ায় কি কি করেছ, তা তোমাদেরকে জানানো হবে। আর এসব কিছুই খোদার জন্যে অতি সহজ ব্যাপার। অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই 'নূরের' প্রতি যা আমি নাযীল করেছি। তোমরা যা কিছু কর, তার প্রতিটি বিষয়ের খবর আল্লাহ রাখেন। এসব কিছুই তোমরা জানতে পারবে সেই দিন, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সেই মহাসম্মেলনের (রোজ হাশর) জন্যে একত্র করবেন। সে দিনটা হবে পরস্পরের জন্যে জয় পরাজয়ের দিন। যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, আল্লাহ তাদের পাপরাশি মিটিয়ে দেবেন। তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশাধিকার দেবেন যেখানে তাদের আবাসগৃহের নিম্নভাগ দিয়ে প্রবাহিত হবে স্রোতস্বিনী। তারা সেখানে বসবাস করবে চিরকাল। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকার করবে এবং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে আমার বাণী ও নিদর্শন, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। সেটা হবে অতীব নিকৃষ্ট স্থান।"−(সূরা তাগাবুন ঃ ৭-১০)

উপরে 'নূর' বলতে কুরআন পাককে বুঝানো হয়েছে।

'তাগাবুন' শব্দের কয়েক প্রকার অর্থ আছে। তা এক একটি করে সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সত্যের বিরোধী যারা তারা সকলেই পরকাল বিশ্বাস করতে চায়নি কিছুতেই। এ ব্যাপারে তারা চরম হঠকারিতা প্রদর্শন করেছে। অথচ তাদের কাছে এমন কোন মাধ্যম ছিল না, এবং আজো নেই যার সাহায্যে তারা নিশ্চিত করে বলতে পারে যে, পরকাল বলে কিছু নেই। গ্রন্থের প্রথম দিকে এ আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মাদকে (সা) উপরোক্ত আয়াতে কাফেরদের কথিত প্রগলভ উক্তির জবাব দিতে বলেছেন আল্লাহ। অবিশ্য জবাব আল্লাহ স্বয়ং বলে দিচ্ছেন। আর আল্লাহর শপথ করেই জবাব দিতে বলা হয়েছে। শপথ তো একমাত্র সেই ব্যক্তিই করতে পারেন যিনি কোন কিছুর সত্যতা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান রাখেন। পরকাল সম্পর্কে নবীর যে জ্ঞান তা শুধু এতটুকু নয় যে আল্লাহ তা বলেছেন। অবিশ্য আল্লাহ কিছু বললেই কোন কিছুর সত্যতা সম্পর্কে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে সেটা হবে কোন কিছু না দেখেও তা অভ্রান্ত ও সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করা। চোখে দেখা বিশ্বাস তা নয়।

আল্লাহ যে মৃতকে জীবিত করতে পারেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় হযরত ইবরাহীমের (আ) ছিল। তবুও মৃতকে জীবিত করার ক্রিয়া তিনি স্বচক্ষে দেখতে চান। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাসে পরিণত করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে চান তিনি। তাই তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা করলেন। অতপর খোদা চারটি মৃত পাখীকে হযরত ইবরাহীমের (আ) চোখের সামনে পুনর্জীবিত করে দেখিয়ে দিলেন। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৬০ আয়াত দ্রষ্টব্য)

এখন মৃতকে জীবিত করার যে বিশ্বাস, তা হযরত ইবরাহীমের (আ) এবং একজন মুমেনের এক হতে পারে না। কিন্তু আমাদের শেষ নবীর (সা) পরকাল ও মৃতকে পুনর্জীবন দানের বিশ্বাস হযরত ইবরাহীমের (আ) উপরোক্ত চাক্ষুষ বিশ্বাসের মতোই ছিল। আল্লাহ তার শেষ এবং প্রিয়তম নবীকে মে'রাজের রাতে তার সৃষ্টি রহস্য এবং আরো অনেক গোপন তথ্যও স্বচক্ষে দেখার সুযোগ দিয়েছিলেন। সে জন্যে পরকালের সত্যতা সম্পর্কে খোদার শপথ করে বলতে তাঁর কোন প্রকার দ্বিধা হওয়ার কথা নয়।

উপরের পবিত্র আয়াতে বর্ণিত "অতপর তোমরা দুনিয়ায় কি কি করেছ, তা তোমাদেরকে জানানো হবে"—কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সূরার প্রারম্ভেই আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি মানুষ সৃষ্টির পর তাকে পরিপূর্ণ কর্ম স্বাধীনতা

দিয়েছেন। সে ইচ্ছা করলে চরম অবিশ্বাসী হয়ে পাপ পথে চলতে পারে। সে হতে পারে নির্মম অত্যাচারী অপরের ধন-সম্পদ ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠনকারী ও রক্ত পিপাসু নরপিচাশ। অথবা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে সে অতি পবিত্র জীবনযাপনও করতে পারে। এই যে ভালো এবং মন্দ পথে চলার স্বাধীনতা এবং এ স্বাধীনতাদানের সাথে একথারও ঘোষণা যে, ভালো-ভাবে চলার জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ পথে চলার শাস্তি অনিবার্য—এরপর একথা কি করে চিন্তা করা যায় যে, এ স্বাধীনতা দানকারী ও সতর্ককারী আল্লাহ মৃত্যুর পর মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন না যে, সে কোন্ পথ অবলম্বন করেছিল ? বস্তুত এটা জানার জন্যেই তো পরকাল। আল্লাহ এমন এক শক্তিশালী সত্তা যিনি জীবন মৃত্যু এজন্যে দিয়েছেন যে, এর দ্বারা তিনি মানুষকে পরীক্ষা করে দেখবেন দুনিয়ার জীবনে কর্মের দিক দিয়ে কে ছিল উত্তম।-(সূরা মূলক ঃ ২ আয়াত দ্রঃ)

অতপর পরকালের এ দিবসকে বলা হয়েছে প্রকৃত জয় পরাজয়ের দিবস।

একথাটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর মধ্যেই নিহিত আছে পরকালের সার্থকতা।

দুনিয়াতে একটি মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি ও কর্মশক্তি নিয়ে জীবন পথে চলা শুরু করে। তার জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার জন্যে তার শ্রম-চেষ্টা-সাধনার অন্ত থাকে না। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কর্মসূচী কার্যকর করে সাফল্য অর্জন করতে চায়। মানুষের প্রতিদিনেরই এই যে শ্রম-সাধনা এর পরিণামে জয় পরাজয় নির্ণীত হয়।

দৃষ্টিভংগী ও জীবন দর্শনের বিভিন্নতার কারণে অবশ্যি জয় পরাজয় অথবা সাফল্য-অসাফল্যের মানদণ্ডও বিভিন্ন হয়ে থাকে। যে কোন হীনপন্থার কার্যসিদ্ধি হলেও অনেকের দৃষ্টিতে তাকে বলা হয় সাফল্য। সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে যদি অন্যায় অবিচার, চরম দুর্নীতি, অসত্য, হীন ও জঘন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়, তবুও তাকে মনে করা হয় সাফল্য। বলপূর্বক অপরের ধন-সম্পদ হস্তগত করে, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা কাউকে সর্বশান্ত করে কেউ হচ্ছে বিজয়ী, লক্ষপতি, কোটিপতি। একেও সাফল্য বলা হয় অনেকের দৃষ্টিতে। বহু গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়ে স্ত্রী-পুত্রসহ পরম সুখে বিলাস বহুল জীবন যাপন করে সে বিজয়ী ব্যক্তি। লোকে বলে লোকটার জীবন সার্থক বটে।

অসাধু উপায়ে অগাধ সম্পদের মালিক হয়ে কেউ বা সমাজে তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সে চায় সকলকে তার পদানত করে রাখতে। তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি সে বরদাশত করতে পারে না। স্বার্থান্বেষী মুসাহিবের দল দিনরাত তার জয়গান করে বেড়ায়। সত্যের আওয়াজ সে সমাজে বন্ধ হয়ে

যায়। সত্যের ধারক ও বাহকরা তার দ্বারা হয় নিপীড়িত ও জর্জরিত। তাদের স্থান হয় কারাগারের অন্ধকার কুঠরিতে। সে ক্ষমতামদমত্ত হয়ে সকলের উপর করতে চায় খোদায়ী। এটাও তার এবং অনেকের মতে বিরাট সাফল্য।

অপরদিকে এক ব্যক্তি সত্যকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে সৎ জীবন যাপন করার চেষ্টা করে। দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, কালো বাজারি, মিথ্যা ও প্রতারণা প্রবঞ্চনা বর্জন করে সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। সত্যের প্রচার ও অসত্যের বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম' করার জন্যে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তার সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে পড়ে। সমাজের অবহেলা অনাদর ও দারিদ্র তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। লোকে বলে, লোকটি নেহায়াত নির্বোধ। নতুবা এমনিভাবে তার জীবন ব্যর্থ হতো না।

উপরে বর্ণিত জীবনের বিজয় সাফল্য ও ব্যর্থতার বাহ্যিক রূপ আমরা আমাদের চারিপাশে হর-হামেশাই দেখতে পাই। কিন্তু সত্যিকার জয় পরাজয় অথবা অসাফল্য নির্ণীত হবে পরকালের বিচারের দিন।

পরকাল যে জয় পরাজয় নির্ণয় করে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

অনেক তাফসীরকার এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, পরকালে বিচারের শেষে বেহেশতবাসীগণ জাহান্নামবাসীর বেহেশতের ঐসব অংশ লাভ করবেন যা শেষোক্ত ব্যক্তিগণ লাভ করতো যদি তারা দুনিয়ার জীবনে বেহেশতবাসীর ন্যায় কাজ করতো। ঠিক তেমনি জাহান্নামবাসীগণ বেহেশতবাসীদের জাহান্নামের ঐসব অংশ অধিকার করবে যা বেহেশতবাসীগণ লাভ করতেন, যদি তাঁরা দুনিয়াতে জাহান্নামবাসীদের মতো জীবন যাপন করতেন।

বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তিই বেহেশতে প্রবেশ করবে তাকে জাহান্নামের সে অংশটি দেখানো হবে যেখানে তার স্থান হতো যদি সে সৎপথ অবলম্বন না করতো। এর ফলে সে খোদার অধিকতর কৃতজ্ঞ হবে। অনুরূপভাবে জাহান্নামবাসীকেও বেহেশতের সে অংশটুকু দেখানো হবে যে অংশ সে লাভ করতো, যদি সে দুনিয়ার জীবনে সৎপথে চলতো। এতে করে তার অনুতাপ অনুশোচনা আরও বেড়ে যাবে।

দুনিয়ায় উৎপীড়িত ও নির্যাতিত যারা তারা পরকালে জালেমদের ততো পরিমাণে নেকি লাভ করবে যা তাদের প্রতি কৃত অবিচার উৎপীড়নের বিনিময় হতে পারে। অথবা মজলুমের সেই পরিমাণ গুনাহ জালেমের ঘাড়ে চাপানো হবে। সেদিন তো মানুষের কাছে কোন ধন-সম্পদ থাকবে না যার দ্বারা সে মজলুমের দাবী পূরণ করতে পারবে। নেকী এবং গুনাহ ব্যতীত কারো কাছে আর অন্য কিছুই থাকবে না। অতএব দুনিয়াতে যদি কেউ কারো প্রতি অন্যায়

করে থাকে, তাহলে মজলুমের দাবী পূরণের জন্য তার কাছে কোন সঞ্চিত নেকি থাকলে তাই মজলুমকে দিয়ে দিতে হবে। অবশ্যি মজলুমের প্রতি যে পরিমাণ অন্যায় করা হবে, ঠিক ততো পরিমণাই সে প্রতিপক্ষের নেকি লাভ করবে। অথবা যালেমের তহবিলে কোন নেকি না থাকলে মজলুমের ততো পরিমাণ গুনাহ যালেমের ঘাড়ে চাপানো হবে।

এ সম্পর্কে বুখারীতে একটি হাদীস আছে যা বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হোরায়রাহ (রা)। হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইয়ের (মানব সন্তানের) প্রতি কোন প্রকার অন্যায় অবিচার করে, তাহলে তার উচিত এখানেই (দুনিয়াতেই) তা মিটিয়ে ফেলা। কারণ আখেরাতে কারো কাছে কোন কপর্দকই থাকবে না। অতএব সেখানে তার নেকির কিয়দংশই সে ব্যক্তিকে দেয়া হবে। অথবা তার কাছে যথেষ্ট নেকি না থাকলে, মজলুমের গুনাহের কিয়দংশই তাকে দেয়া হবে।

অনুরূপভাবে মসনদে আহমদে জাবের বিন আবদুল্লাহ বিন উনায়েস কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) বলেছেন, কোন বেহেশতী বেহেশতে এবং কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে তার কৃত অন্যায় ও জুলুমের দাবী মিটিয়ে দিয়েছে। এমন কি কাউকে একটি মাত্র চপেটাঘাত করে থাকলেও তার বদলা (বিনিময়) তাকে দিতে হবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, "অতপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে, তা কেমন করে হবে ? আমরা তো সেদিন কপর্দকহীন হবো।"

নবী বলেন, "পাপ-পুণ্যের দ্বারা সে বদলা দিতে হবে।"

মুসলিম শরীফে এবং মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হোরায়রাহর (রা) একটি বর্ণনা আছে। একদা নবী করিম (সা) সমবেত সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে ?"

তাঁরা বললেন, যে কপর্দকহীন এবং যার কোন ধন-সম্পদ নেই, সেই তো নিঃস্ব।"

নবী (সা) বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতি সৎকাজগুলো সংগে নিয়ে কিয়ামতের মাঠে হাজির হবে এমন অবস্থায় যে সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো নিন্দা অপবাদ করেছে, কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে মেরেছে। অতপর তার পুণ্যসমূহ মজলুমদের মধ্যে বন্টন করা হলো। তারপরেও বদলা পরিশোধের জন্যে তার কাছে আর কোনই পুণ্য অবশিষ্ট

রইলো না। তখন মজলুম দাবীদারদের গুনাহের বোঝা তার উপরে চাপানো হলো এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো।"

বিরাট পুণ্যের মালিক মজলুমদের বদলা পরিশোধ করতে গিয়ে বিরাট পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে জাহান্নামে গেল। কি ভয়ানক পরিণাম ! চিন্তা করতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আল্লাহ রক্ষা করুন আমাদেরকে এ ধরনের পরিণাম থেকে।

বিরাট প্রবঞ্চনা

উপরে উল্লেখিত আয়াতে "তাগাবুন" শব্দটি আরবী ভাষায় প্রতারণা প্রবঞ্চনা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত দেখা যায়, দুনিয়ায় মানুষ শির্ক, কুফর, অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার, লাম্পট্য, খুন-খারাবি প্রভৃতি বড় বড় পাপ কাজে নিশ্চিন্ত মনে ও পরম আনন্দে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। তাদের পরস্পরের মধ্যে এ ব্যাপারে গভীর বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ স্থাপিত হয়।

চরিত্রহীন পথভ্রষ্ট পরিবারের লোকজন, পাপাচার ও গোমরাহীর প্রচারক নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীগণ, দস্যু-তস্করের দল, গোমরাহী পাপাচার ও অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারকারী পার্টি ও কোম্পানীগুলো এবং ব্যাপক অন্যায় অবিচার ও ফেৎনা ফাসাদের ধারক বাহক রাষ্ট্র ও জাতিসমূহ একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে পাপাচার ছড়াবার ব্যাপারে। কোন দুর্বল দেশ ও রাষ্ট্রকে পদানত করে তার অধিবাসীবৃন্দকে গোলাম বানাবার জন্যে একাধিক রাষ্ট্র অভিযান চালায় এ বিশ্বাসের উপরে যে তাদের মধ্যে বিরাট বন্ধুত্ব (Alliance) অথবা সামরিক চুক্তি (Military pact) সাধিত হয়েছে।

পরস্পর সম্পর্ক রক্ষাকারী প্রত্যেকেই এ ধারণাই পোষণ করে থাকে যে, তারা একে অপরের পরম বন্ধু এবং চরম সাফল্যের সাথেই তাদের সাহায্য সহযোগিতা চলছে। কিন্তু তারা যখন পরকালে বিচারের মাঠে হাজির হবে, তখন তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা চরমভাবে প্রতারিত হয়েছে। উপরে বর্ণিত লোকগুলোর প্রত্যেকেই অনুভব করবে যে, শুভাকাংখী পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু, লীডার অথবা যাকে সে সহযোগী মনে করতো, সে প্রকৃতপক্ষে তার চরম শত্রু। সেদিন সকল সংশ্রব-সম্বন্ধ, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, Alliance অথবা pact শত্রুতায় পরিণত হবে। সেদিন একে অপরের প্রতি গালিবর্ষণ ও অভিসম্পাৎ করবে। প্রত্যেকেই চাইবে তার দোষ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে, যাতে করে প্রতিপক্ষই চরম শাস্তি ভোগ করে। এ সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে।

পাপীদের পরস্পরের প্রতি দোষারোপ

মানুষ তার মানবিক দুর্বলতার কারণে অনেক সময় অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। স্বামী স্ত্রীর জন্যে, পিতা সন্তানের জন্যে, বন্ধু বন্ধুকে খুশী করার জন্যে, রাজনৈতিক নেতা ও পীর-ওস্তাদকে তুষ্ট করতে গিয়ে, উর্ধ্বতন কর্মচারীকে খুশী করে চাকুরী বহাল রাখতে অথবা উন্নতিকল্পে, অথবা অত্যাচারী শাসকের মনস্তুষ্টির জন্যে অনেকে পাপ কাজে লিপ্ত হয়। তাদের এ নির্বুদ্ধিতার কারণে পরকালে তাদেরকে চরমভাবে প্রতারিত ও নিরাশ হতে হবে। পবিত্র কুরআনে বার বার সে কথারই উল্লেখ করে এ ধরনের আত্ম-প্রবঞ্চিত দলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তার কিছু উদ্বৃতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ وَرَاَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ط كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ط وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ○

"যাদের কথায় লোকেরা চলতো, তারা কিয়ামতে তাদের অনুসারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে কেটে পড়বে। উভয়ে সেদিনের ভয়ংকর শাস্তির ভয়াবহতা দর্শন করবে। উভয়ের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসারীদল বলতে থাকবে, যদি কোন প্রকারে আমরা একবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, তাহলে আমরা সেখানে এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যেতাম যেমন আজ তারা আমাদের থেকে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সকলকেই তাদের কর্মফল দেখিয়ে দেবেন যা তাদের জন্যে বহন করে আনবে অনুতাপ অনুশোচনা। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা সে জাহান্নামের অগ্নি থেকে কোনক্রমেই বের হতে পারবে না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৬-১৬৭)

খোদার প্রতি মিথ্যা দোষারোপকারীদেরকে মৃত্যুকালে আল্লাহর ফেরেশতা-গণ জিজ্ঞেস করবেন ঃ

قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ط كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ

أُخْتَهَا ط حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا لا قَالَتْ أُخْرٰهُمْ لِأُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ أَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ط قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَقَالَتْ أُوْلٰهُمْ لِأُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

"আল্লাহ ব্যতীত আর যাদের বন্দেগী তোমরা করতে তারা আজ কোথায় ? তারা বলবে যে, তারা তাদের কাছ থেকে সরে পড়েছে। অতপর তারা স্বীকার করবে যে, তারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসই করেছে। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের পূর্বে জ্বিন এবং মানুষের মধ্যে যে দল অতীত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর। অতপর এদের একটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরই অনুরূপ দলের প্রতি অভিসম্পাৎ করতে থাকবে। যখন সব দলগুলো সেখানে একত্র হবে, তখন পরবর্তী দল তার পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে একথা বলবে, হে প্রভু, ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উভয়ের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি। কিন্তু এ সম্পর্কে তোমরা কোন জ্ঞান রাখ না। তাদের প্রথমটি শেষেরটিকে বলবে, তোমরা আমাদের চেয়ে মোটেই উত্তম নও। অতএব তোমাদের অর্জিত কর্মের শাস্তি ভোগ কর।"—(সূরা আল আরাফ ঃ ৩৭-৩৯)

সাধারণত দেখা যায় যারা দুর্বল, বিত্তহীন, শাসিত ও শোষিত তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ক্ষমতাসীন অত্যাচারী শাসকদের আনুগত্য করে। পরকালে তাদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

"যখন উভয় দলকে হাশরের মাঠে একত্র করা হবে, তখন দুর্বল শ্রেণী ক্ষমতা গর্বিত উন্নত শ্রেণীর লোকদেরকে বলবে, "আমরা তোমাদেরই কথা মেনে চলেছিলাম। আজ তোমরা কি খোদার আযাবের কিছু অংশ আমাদের জন্যে লাঘব করতে পার ? তারা বলবে, তেমন কোন পথ আল্লাহ আমাদেরকে দেখালে তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। এখন এ

শাস্তি আমাদের জন্যে অসহ্য হোক অথবা ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করি উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। এখন আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।"
-(সূরা ইবরাহীম ঃ ২১)

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا لا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ز وَّمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

"হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রতিমাগুলোকে খোদা বানিয়ে নিয়েছ, এ তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের কারণেই। কিন্তু কিয়ামতে তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধাচারণ ও অভিসম্পাৎ করবে। আর তোমাদের চূড়ান্ত বাসস্থান হবে জাহান্নাম। তোমাদের থাকবে না কোন সাহায্যকারী।"-(সূরা আনকাবুত ঃ ২৫)

উপরের আয়াতে একথাই বলা হয়েছে যে, বিশ্ব স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাগুলোকে খোদা বানিয়ে নেয়ার পশ্চাতে কোন যুক্তিই নেই। লোকেরা তাদেরকে খোদা বানাবার ব্যাপারে একে অপরের বন্ধু হিসেবে কাজ করেছে, তাদের পারস্পরিক স্বার্থ ও বন্ধুত্ব তাদেরকে এ প্রতিমা পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের এ ভুল তারা পরকালে বুঝতে পারবে।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وقفه وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

"হে মানবজাতি ! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রভু খোদাকে এবং ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কোন পিতা তার পুত্রের এবং কোন পুত্র তার পিতার কোনই কাজে লাগবে না। আল্লাহ (কিয়ামত সম্পর্কে) তোমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তা এক অনিবার্য সত্য। অতএব তোমাদেরকে তোমাদের পার্থিব জীবন যেন প্রবঞ্চিত না করে এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে ভুলিয়ে না রাখে আল্লাহ থেকে।"-(সূরা লুকমান ঃ ৩৩)

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ○ وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ○ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ○

"সেই কিয়ামতের দিনে যখন তাদেরকে জাহান্নামে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা বলবে, আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলকে মেনে চলতাম। এবং তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু। হায়রে আমরা তো আমাদের নেতা ও মুরব্বিদের কথা মেনেই চলছিলাম। অতএব হে প্রভু তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন এবং তাদেরকে চরমভাবে অভিশপ্ত করুন।"
-(সূরা আল আহযাব ঃ ৬৬-৬৮)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلاَ بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ط
وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى
بَعْضِ نِ الْقَوْلَ ج يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ
اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ○ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا
اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ○
وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ
تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ط وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا
رَاَوُا الْعَذَابَ ط وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط هَلْ يُجْزَوْنَ
اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

"এসব কাফেরগণ বলে, কিছুতেই কুরআন মানব না। আর এর আগের কোন কিতাবকেও মানব না। তোমরা যদি তাদের অবস্থা দেখতে যখন এ জালেমরা তাদের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং একে অপরের প্রতি দোষারুপ করতে থাকবে। সেদিন অসহায় দুর্বলরা গর্বিত সমাজ-পতিদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে তো আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনতাম। গর্বিত সমাজপতিরা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের নিকটে হেদায়েতের বাণী পৌঁছার পর আমরা কি তোমাদেরকে সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম ? তোমরা নিজেরাই তো অপরাধ করেছ। দুর্বলেরা বড়লোকদেরকে বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বরঞ্চ তোমাদের দিবা-রাত্রের চক্রান্তই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিল। আল্লাহকে অস্বীকার করার এবং দাসত্বে আনুগত্যে তাঁর অংশীদার বানাবার জন্যে তোমরাই তো আমাদেরকে আদেশ করতে। আল্লাহ্ বলেন, তারা যখন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের লজ্জা অনুশোচনা গোপন করার চেষ্টা করবে।

আমরা এসব সত্য অস্বীকারকারীদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দেব। যেমন তাদের কর্ম, তেমনি তারা পরিণাম ফল ভোগ করবে।"

–(সূরা সাবা ঃ ৩১-৩৩)

আবার দেখুন, সমাজে যেসব খোদাবিমুখ ও খোদাদ্রোহী ক্ষমতাসীন হয়ে অপরের উপরে শাসন চালায়, সত্যের আহ্বানকারীদের সাথে তাদের চরম বিরোধ শুরু হয়। সত্যাশ্রয়ী খোদাভীরুদেরকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে এবং সমাজের ফেৎনা ফাসাদের জন্যে ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণী সত্যের আহ্বান-কারীদেরকে পথভ্রষ্ট, ভণ্ড, ধর্মের মুখোশধারী এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বলে দোষারোপ করে। কিন্তু পরকালে তারা চরমভাবে প্রতারিত হবে যখন তাদের কাছে প্রকৃত সত্য প্রকট হয়ে পড়বে। তারা বলবে ঃ

وَقَالُوْا مَالَنَا لَانَرٰى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ط

"এবং তারা (দোযখের মধ্যে থেকে) বলবে, কি ব্যাপার তাদেরকে তো আমরা দেখছি না যাদেরকে আমরা দুষ্ট লোকের মধ্যে গণ্য করতাম।"

–(সূরা সোয়াদ ঃ ৬২)

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদেরকে বলবেন ঃ

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ○ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ
الْجَحِيْمِ ○ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ○ مَالَكُمْ لَاتَنَاصَرُوْنَ ○ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ
مُسْتَسْلِمُوْنَ ○ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○ قَالُوْآ
اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ○ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ج بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ○ فَحَقَّ
عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ق اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ○ فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ○ فَاِنَّهُمْ
يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ○ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○

"আজ সেই চূড়ান্ত মীমাংসার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (তারপর আল্লাহর আদেশ হবে) এসব যালেমদেরকে তাদের সংগী-সাথীদের এবং যাদের হুকুম মেনে এরা চলতো তাদেরকে ঘেরাও করে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও। আচ্ছা, একটু তাদেরকে দাঁড়

করাও। তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তোমাদের কি হলো যে, একে অপরের আজ কোন সাহায্য করছ না ? বাঃরে আজ তো দেখি এরা নিজেদেরকে একে অপরের উপরে ছেড়ে দিচ্ছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও অনুসারী পরস্পর মুখোমুখি হয়ে কথা কাটাকাটি করবে। অনুসারীগণ বলবে, তোমাদের আগমন আমাদের উপর ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করতো অর্থাৎ তোমাদের আদেশ না মেনে আমাদের উপায় ছিল না। নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলবে, তোমরা তো নিজেরাই ইচ্ছা করে ঈমান আননি। তোমাদের উপরে আমাদের এমন কি কর্তৃত্ব ছিল ? বরঞ্চ তোমরা নিজেরাই ছিলে অবাধ্য নাফরমান। এখন আমাদের প্রভুর উক্তি সত্যে পরিণত হয়েছে। এখন আমাদের সে শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (পরে তারা স্বীকার করে বলবে) আমরা তোমাদেরকে বিপদগামী করেছি এবং আমরা নিজেরাও বিপদগামী ছিলাম। আল্লাহ বলেন, উভয় দলই ঐদিন শাস্তি গ্রহণের ব্যাপারে সমান অংশীদার হবে। অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপ ব্যবহারই করে থাকি।"

–(সূরা আস সাফফাত ঃ ২১-৩৪)

যারা নিছক পার্থিব স্বার্থের জন্যে খোদাদ্রোহী ও খোদাবিমুখ নেতৃবৃন্দ এবং শাসকদের মনস্তুষ্টির জন্যে খোদার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, উপরের আলোচনা থেকে তাদের শিক্ষাগ্রহণ করা দরকার।

নবী করিম (সা) তাই ঘোষণা করেন ঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ ○

"আল্লাহর নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির (মানুষ) আনুগত্য কিছুতেই করা যেতে পারে না।"

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

"যারা আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকার করেছিল, তারা কিয়ামতের দিন বলবে, হে আমাদের প্রভু। জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দিন। আমরা আজ তাদেরকে পদদলিত করে হেয় ও অপমানিত করবো।"–(হামীম আস সাজদা ঃ ২৯)

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ○ يُبَصَّرُوْنَهُمْ ط يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ـ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُئْوِيْهِ ○

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ○ كَلَّا ط اِنَّهَا لَظٰى ○ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ○

"কিয়ামতের দিন বন্ধুদের পরস্পর সাক্ষাত হলে তারা কেউ কারো সাথে কথা বলবে না। পাপীরা সেদিন মনে করবে, সেদিনের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে তার বিনিময়ে তার পুত্র, স্ত্রী, ভ্রাতা, পরিবারস্থ লোকজন, এমন কি দুনিয়ার সবকিছুই সে বিলিয়ে দিতে পারে এত করেও যদি সে পরিত্রাণ পায় এ আশায়। কিন্তু তা কখনও হতে পারে না। শাস্তি তাদের হবেই, জাহান্নামের অগ্নিশিখা সেদিন তাদের চর্ম ভস্মিভূত করবেই।"–(সূরা মায়ারেজ ঃ ১০-১৬)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ○

"কিয়ামতের সে ভয়ংকর দিনে মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, স্ত্রী এবং পুত্র থেকে দূরে পলায়ন করবে। সেদিন প্রত্যেকেই এত ভীতসন্ত্রস্ত ও ব্যস্ত থাকবে যে, অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করার তার ফুরসৎ থাকবে না।"
–(সূরা আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

খোদাদ্রোহী ও খোদাবিমুখ লোকেরা পরকালে যে বিরাট প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার সম্মুখীন হবে তা উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে।

এ দুনিয়ার বুকে কিছু লোক কিছু মানুষকে খোদার শরীক বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ এসব বানাওটি খোদার শরীকদেরকে খুশী করার জন্যে বিশ্বস্রষ্টা খোদার কথা ও নির্দেশ তারা অমান্য করেছে এবং সেরাতুল মুস্তাকীম পরিত্যাগ করে জীবনের ভুল পথ অবলম্বন করছে। তাদেরকে প্রকাশ্যে 'ইলাহ্' অথবা 'রব' বলে সম্বোধন করা হোক আর না হোক, যখন তাদের এমনভাবে আনুগত্য করা হয়েছে যেমন খোদার আনুগত্য করা উচিত, তখন তাদেরকেই খোদার অংশীদার বা শরীক করা হয়েছে। এসব বাতিল খোদা বা খোদার অংশীদার এবং তাদের অনুসারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ج اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ج تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ز مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ○ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْا

هُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ج لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ○

"(তারা যেন সেদিনকে ভুলে না যায়) যেদিন খোদা তাদেরকে ডেকে বলবেন, আজ কোথায় আমার সেসব অংশীদারগণ যাদেরকে তোমরা আমার অংশীদার মনে করতে ? একথা যাদের প্রতি আরোপিত হবে তারা বলবে, 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! এরাই হচ্ছে ঐসব লোক যাদের আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা যেমন পথভ্রষ্ট ছিলাম, তেমনি তাদেরকেও আমরা পথভ্রষ্ট করেছি।' তারপর তাদের অনুসারীদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বানিয়েছিলে, তাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাক।' তারা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা কোন জবাব দিবে না। তখন উভয় দল জাহান্নামের শাস্তি আসন্ন দেখতে পাবে। কতই না ভালো হতো যদি তারা সৎপথ অবলম্বনকারী হতো।"-(আল কাসাস ঃ ৬২-৬৪)

পরকাল লাভ-লোকসানের দিন

উপরে উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের আয়াতে পরকালকে ইয়াওমুত্তাগাবুন বলা হয়েছে। 'তাগাবুন' শব্দের অর্থ জয়-পরাজয় এবং প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, যার সম্যক আলোচনা উপরে করা হয়েছে। উপরন্তু ব্যবসার লাভ-লোকসানকেও আরবী ভাষায় 'তাগাবুন' বলা হয়। অর্থাৎ পরকাল সত্যিকারভাবে লাভ-লোকসানের দিন।

মানুষ এ আশা হৃদয়ে পোষণ করে ব্যবসা করে যে, সে তার ব্যবসার দ্বারা লাভবান হবে। তার ব্যবসা লাভজনক হলে স্বভাবতঃই সে আনন্দিত হয়। ক্ষতির সম্মুখীন হলে, সে হয় দুঃখিত মর্মাহত।

দুনিয়ার মানুষ সারা জীবনভর যা কিছু করছে তাকে আল্লাহ একটা ব্যবসার সংগে তুলনা করেছেন। অতপর ব্যবসার লাভ-লোকসান জানা যাবে পরকালের বিচার দিনে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ
اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ
وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ
عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসার কথা বলব না যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে ? সে ব্যবসা হচ্ছে এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্, তাঁর রসূলের উপর এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম কাজ যদি তোমরা জ্ঞান রাখ। অতপর আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাবেন (চির বসবাসের জন্যে) যার নিম্নভাগ দিয়ে প্রবাহিত থাকবে স্রোতস্বিনী এবং চিরদিনের বাসস্থান ও বাগানসমূহে তোমাদেরকে দান করবেন সুরম্য আবাসগৃহ। এটা হলো প্রকৃতপক্ষে বিরাট সাফল্য।"-(সূরা আস সফ ঃ ১০-১২)

ব্যবসা এমন এক বস্তু যার মধ্যে মানুষ তার মূলধন, সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও জ্ঞানবুদ্ধি বিনিয়োগ করে। এসব এ জন্যে সে করে যে, তার দ্বারা সে লাভবান হবে। কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে ঈমান এবং আল্লাহর পথে জিহাদকে[১] ব্যবসা বলা হয়েছে। মানুষ যদি তার সবকিছুই এ কাজে নিয়োজিত করে তাহলে সে যা লাভ করবে তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। তা প্রধানত তিনটি ঃ

০ সে পরকালে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে।

০ আল্লাহ্ তার পাপরাশি মাফ করবেন।

০ এমন বেহেশতে তার স্থান হবে, যেখানে সে ভোগ করবে আল্লাহর অফুরন্ত সুখ সম্পদ। সেটা হবে তার চিরন্তন বাসস্থান। আর এসব কিছুকেই বলা হয়েছে বিরাট সাফল্য। বিরাট সাফল্য কথাটি এখানে উপরোক্ত আলোচনায় জানা গেল যে, পরকাল প্রকৃতপক্ষে মানুষের চিরন্তন লাভ-লোকসানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী।

পূর্বের আলোচনায় একথাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, পরকাল অর্থাৎ মরণের পরের যে জীবন তা এক অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য সত্য। এর যে আবশ্যকতা আছে তাও বলা হয়েছে।

---

১. 'জিহাদ' শব্দের অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। কোন কিছু লাভ করার জন্যে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সকল প্রকার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সকল উপায়-উপাদান কাজে লাগানোকে জিহাদ বলে। জিহাদ দুই ধরনের হতে পারে। আল্লাহর পথে জিহাদ এবং শয়তানের পথে জিহাদ। একমাত্র আল্লাহর সন্তোষলাভের জন্যে এবং তাঁরই নির্ধারিত রীতি-পদ্ধতির মাধ্যমে যে জিহাদ, তাকে বলা হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদ। নিছক পার্থিব ও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে যে জিহাদ, তাহলো শয়তানের পথে জিহাদ। অন্যকথায় আল্লাহর দ্বীনের মুকাবিলায় যে জিহাদ, তাকেই বলা হয়েছে শয়তানের পথে বা তাগুতের পথে জিহাদ। সকল যুগেই সত্য দ্বীনের মুকাবিলায় শয়তানের পথে জিহাদ করেছে খোদাদ্রোহী শক্তিগুলো। বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সব ভালো, যার শেষ ভালো। অতএব পরকালের শেষ জীবনের যে সাফল্য, তা হবে সত্যিকার সাফল্য।

• প্রকৃত ব্যাপার এই যে, দুনিয়ার জীবনটা হলো মানুষের এক বিরাট পরীক্ষা কেন্দ্র।

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

"আল্লাহ জীবন এবং মৃত্যু এ জন্যে দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট।
–(সূরা মুলক ঃ ২)

মানুষকে বিবেক, ভালো-মন্দের জ্ঞান এবং কর্ম স্বাধীনতা দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে। পাঠানো হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। তার জীবনের কর্মসূচীও বলে দেয়া হয়েছে তাকে। তার সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যিনি তাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছেই তাকে ফিরে যেতে হবে। প্রত্যাবর্তনের পর স্বভাবতই এবং সম্পূর্ণ ন্যায়সংগতভাবেই তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তাকে যে কর্মসূচী দেয়া হয়েছিল তা সে কতখানি পালন করেছে।

তার জীবনের কর্মসূচী হলো পবিত্র কুরআন। যার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হচ্ছে শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফার (সা) সমগ্র জীবন। সে জন্যে এ জীবন প্রতিটি মানুষের জন্যেই এক মহান ও অপরিহার্য আদর্শ।

মানুষ তার উক্ত কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে। আর অবহেলা করলে তাকে অবশ্য অবশ্যই শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা না করা তার স্বাধীনতার উপরেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এটাই হলো তার বিরাট অগ্নি পরীক্ষা। পাশের আনন্দ এবং পাশ না করার দুঃখ তো এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। পরীক্ষার্থী তার কর্তব্যে অবহেলা করলে তাকে চরম অনুতাপ অনুশোচনার সম্মুখীন হতে হয় এটা তো কোন নতুন কথা নয়।

পরকালের পাঁচটি প্রশ্ন

বিচার দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা মানবজাতিকে যে প্রধান কয়টি প্রশ্ন করবেন সে সম্পর্কে তিরমিযি শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা)। বলা হয়েছে ঃ

لاَتَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلُ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عَمْرِهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا اَبْلاَهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَا عَمَلَ فِيْمَا عَلِمَ ۔ (ترمذی)

সেদিন মানব সন্তানকে প্রাধানত পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। তার জবাব না দিয়ে তার এক পা অগ্রসর হবার উপায় থাকবে না। প্রশ্নগুলো হচ্ছে ঃ

০ তার জীবনের সময়গুলো সে কোন্ কাজে ব্যয় করেছে।

০ (বিশেষ করে) তার যৌবনকাল সে কোন্ কাজে লিপ্ত রেখেছে।

০ সে কিভাবে তার অর্থ উপার্জন করেছে।

০ তার অর্জিত অর্থ-সম্পদ সে কিভাবে কোন্ পথে ব্যয় করেছে।

০ সে যে সত্য জ্ঞান লাভ করেছিল, তার কতটা সে তার জীবনে কার্যকর করেছে।

উপরোক্ত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে মানব সন্তানের সমগ্র জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। মানুষ তার জীবন দুই প্রকারে অতিবাহিত করতে পারে। প্রথমত আল্লাহ, রসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনের পর আল্লাহর আনুগত্যের ভিতর দিয়ে জীবনযাপন করা।

দ্বিতীয়ত খোদার আনুগত্যের বিপরীত এক খোদাদ্রোহী ও খোদাবিমুখ জীবনযাপন করা। পাপাচার, অনাচার, অপরের প্রতি অন্যায় অবিচার উৎপীড়ন, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, নর হত্যা প্রভৃতি খোদাদ্রোহী ও খোদাবিমুখ জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ। এ দু'টির কোন্‌টি সে করেছে সে প্রশ্নই করা হবে।

উপরে বর্ণিত প্রথম প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্যি প্রথম প্রশ্নের পর অন্যান্য প্রশ্নের কোন প্রয়োজন করে না। কিন্তু অন্যান্য প্রশ্নগুলোর দ্বারা মানুষের দুর্বলতা কোথায় তার প্রতি অংগুলি নির্দেশ করা হয়েছে।

যৌবনকাল মানব জীবনের এমন সময় যখন তার কর্মশক্তি ও বৃত্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। আর বিকশিত হয় তার যৌন প্রবণতা। কূলে কূলে ভরা

যৌনবদীপ্ত নদী সামান্য বায়ুর আঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তার সীমালংঘন করে দুকূল প্লাবিত করে। ঠিক তেমনি মানব জীবনের ভরা নদীতে প্রবৃত্তির দমকা হাওয়ায় তার যৌন তরংগ সীমালংঘন করতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়। এখন প্রবৃত্তিকে বল্গাহীন করে ছেড়ে দেয়া অথবা তাকে দমিত ও বশীভূত করে রাখা-এর মধ্যেই মানুষের প্রকৃত অগ্নি পরীক্ষা। যৌবনকালে মানুষ তার দৈহিক ক্ষমতার অপব্যবহারও করতে পারে। অথবা সংযম, প্রেম ও ভালোবাসা, ক্ষমা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণের দ্বারা মানবতার সেবাও করতে পারে। সে জন্যে এ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নদ্বয় প্রকৃত মানব চরিত্রের পরিচয় দান করে। অর্থ ও ধন-সম্পদ উপার্জন করা মানবের এক স্বাভাবিক চাহিদা। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনও অত্যধিক।

ধন উপার্জন ও ব্যয়-উভয়ের একটি নীতি নির্ধারিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কেননা অর্থ উপার্জন, ব্যয় ও বন্টনের উপরে গোটা মানব সমাজের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি নির্ভরশীল।

অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের বেলায় কোন নীতি অবলম্বন করা যে প্রয়োজন এটা অনেকে স্বীকার করে না। তাদের মতে যে কোন উপয়ে অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে অপরকে শোষণ করে অথবা অশ্লীলতার মাদকতায় বিভ্রান্ত করে সম্পদ উপার্জনের বেলায় যেমন থাকবে অবাধ স্বাধীনতা, ব্যয়ের বেলায়ও ঠিক তেমনই তাদের স্বাধীনতা কাম্য। অর্জিত ধন-সম্পদের একটা অংশ ধনহীনদের মধ্যে বন্টন না করে অথবা কোন মঙ্গলজনক কাজে ব্যয় না করে নিছক বিলাসিতায় ও ভোগ-সম্ভোগে, অনাচার, পাপাচার ও অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা তাদের মতে মোটেই দূষণীয় নয়। অসাধু ও গর্হিত উপায়ে গোটা সমাজের ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জিভূত করে অন্যান্যকে নগ্ন ও ক্ষুধার্ত রাখাও তাদের চোখে অন্যায় নয়।

আবার এহেন অসম ও অবিচারমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে যারা ধন-সম্পদ, উপার্জন ও ব্যয় বন্টন নীতি রাষ্ট্রায়ত্ত করে সমগ্র জাতিকে রাজনৈতিক গোলামে পরিণত করা হয়। সে দেশের মানব সন্তানেরা তখন পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। থাকে না তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অথবা মানবিক কোন মর্যাদা। গৃহস্তের গরু-মহিষের মতো তাদেরকে চোখ বুজে মাঠে-ময়দানে কাজ করে ফসল ফলাতে হয়। যার উপরে থাকে না তাদের কোনই অধিকার। এ অবিচারমূলক ব্যবস্থাও অনেকের কাছে দূষণীয় নয়।

কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে, সৎপথে সদুপায়ে যেমন প্রত্যেককে অর্থ উপার্জন করতে

হবে, তেমনি সৎপথে ও সদুদ্দেশ্যেই তা ব্যয় করতে হবে। অর্জিত ধন-সম্পদ থেকে দরিদ্র, অক্ষম, অসহায়, অন্ধ, আতুর, উপার্জনহীন আর্ত মানুষকে দান করতে হবে। অর্জিত সম্পদ যেন রক্ষিত সঞ্চয় হিসেবে পড়ে না থাকে অথবা তা ভোগ-বিলাসিতায় ব্যয়িত না হয়, তার জন্যেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ জন্যেই পরকালে এ দু'টি প্রশ্নের গুরুত্ব অনেক।

পঞ্চম ও শেষ প্রশ্নটি হলো এই যে, মানুষের নিকটে যখন সত্যের আহ্বান এলো, অথবা যখন সে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলো, তখন সে তা গ্রহণ করলো, না বর্জন করলো, অতপর সত্য জ্ঞান লাভ করার পর তদনুযায়ী সে তার চরিত্র গঠন করলো কিনা। সে জ্ঞানের উদ্ভাসিত আলোকে সে জীবনযাত্রা করেছে কিনা। প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পার্থিব ভোগ বিলাসের জন্যে, অথবা সত্যের দিকে আহ্বানকারীর প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ পোষণ করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকলে সে কথাও বিচার দিবসে খোদার দরবারে পেশ করতে হবে।

ইহুদী জাতির আলেম সমাজ শেষ নবীর আহ্বানকে সত্য বলে উপলব্ধি করার পরও পার্থিব স্বার্থে ও শেষ নবীর প্রতি অন্ধ বিদ্বেষে বিরোধিতায় মেতে উঠেছিল। বর্তমানকালের মুসলিম সমাজের একটা বিরাট অংশ সেই ভুলের স্রোতেই ভেসে চলেছে।

আত্মা

একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কবর আযাব হয় কি আত্মার উপরে, না দেহের উপরে। এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেন শুধু আত্মার উপরে। কেউ বলেন আত্মা ও দেহ উভয়ের উপরেই। এতদ প্রসংগে আত্মা বস্তুটি কি তারও আলোচনা হওয়া দরকার।

আত্মা এক অদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তু হলেও, এক অনস্বীকার্য সত্তা ! তাই এর বিশ্লেষণও বড়ই কঠিন। আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

"যখন আমি তাকে পরিপূর্ণরূপে বানিয়ে ফেলব এবং তার ভেতরে আমার রূহের মধ্য থেকে কিছুটা ফুৎকার করে দেব, তখন তোমরা যেন তার সামনে সেজদারত হও।–(সূরা আল হিজর ঃ ২৯)

উপরের আয়াত থেকে বুঝতে পারা যায় যে, মানুষের দেহে যে আত্মা ফুৎকারিত হয়েছিল তা আসলে আল্লাহর গুণাবলীর একটা সূক্ষ্ম আলোকচিত্র। আয়ু, জ্ঞান, শক্তি-ইচ্ছা ও এখতিয়ার প্রভৃতি এবং অন্যান্য সব গুণাবলী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, যার সমষ্টির নাম আত্মা, তা খোদায়ী গুণাবলীর একটা সূক্ষ্ম প্রতিবিম্ব বা আলোকচিত্র যা মানব দেহে নিক্ষিপ্ত বা ফুৎকারিত করা হয়েছে।

আত্মার সঠিক বিশ্লেষণ যে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। তবে আমরা শুধু এতটুকু উপলব্ধি করতে পারি যে আত্মা দেহকে সজীব ও সচল রাখে। তার অনুপস্থিতি মানুষকে নিশ্চল মৃতদেহে পরিণত করে।

আত্মা এমন এক বস্তু যা কখনো দৃশ্য না হলেও স্পষ্ট অনুভব করা যায়। এ এমন রহস্যময় শক্তি যা মানব দেহের সংগে সংযোজিত হওয়ার সাথে সাথেই সে সজীব ও সক্রিয় হয়ে উঠে।

আসলে আত্মাই প্রকৃত মানুষ। দেহ সে মানুষের বাহন বা খোলস মাত্র। আত্মা সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তু হলেও তার একটা আকৃতি আছে এবং সে আকৃতি অবিকল দেহেরই মতন। আত্মাই আসল। দেহটা নকল। 'আমি' বলতে সে আত্মা মানুষকেই বুঝায়। দুঃখ-বেদনা, আনন্দ সুখ সবই 'আমার' (আত্মার) দেহের নয়। মানুষ (আত্মা) এবং দেহ দু'টি পৃথক সত্তা হলেও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সুখ-দুঃখ দেহের মধ্যে অনুভূত হয়। আবার অনেক সময় সুখ-দুঃখ আনন্দ দেহ ছাড়াও হয়। দেহের সম্পর্ক বস্তুজগতের সংগে আত্মার সম্পর্ক অনন্ত অদৃশ্য জগতের সংগে।

কবরে অথবা মৃত্যুর পরজগতে আত্মা সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে পারবে, এটা ধারণা করা কঠিন নয়। অবশ্যি পূর্বে বলা হয়েছে যে, সে জগতের সঠিক ধারণা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত। তবে খানিকটা অনুমান করা যায় মাত্র।

ঘুমের ঘোরে যে মানুষটি (আত্মা) দেহ পরিত্যাগ করে অন্যত্র বিচরণ করে ভিন্ন দেশে ভিন্ন সমাজে জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে তারও সুখ-দুঃখের পূর্ণ অনুভূতি থাকে। তারও পরিপূর্ণ অংগ-প্রত্যংগ বিশিষ্ট একটা অশরীরি দেহ থাকে। আবার সুখ-দুঃখ বলতে তো আত্মারই। তাই দুঃস্বপ্নে কখনো দেহ পরিত্যাগকারী অদৃশ্য মানুষটি ব্যথা-বেদনায় অধীর হয়ে অশ্রু বিসর্জন করে। জাগ্রত হবার পর দেখা যায় শয্যায় শায়িত দেহধারী ব্যক্তিটির অশ্রুতে গণ্ডদেশ সিক্ত হয়েছে। অথচ আত্মা মানুষটির অশ্রু বিসর্জন ও তার কারণ সংঘটিত হয়েছে হয়তো বা শত শত হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানে। স্বপ্নে কঠোর পরিশ্রমের পর যে শ্রান্তি অনুভূত হয় তার প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হবার পর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। কোলকাতায় থাকাকালীন আমাদের পাড়াতেই একরাতে জনৈক খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় স্বপ্নে বল খেলছিলেন। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে উচ্চস্বরে গোল বলে চীৎকার করে বল কিক করলেন। তার পার্শ্বে শায়িতা স্ত্রীকে তার কিক লাগার ফলে রাতেই ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল।

অদৃশ্য আত্মা মানুষটি হয়তো শয্যাস্থল থেকে দূরে বহুদূরে কোথাও বাঘ ভালুক অথবা দস্যু তস্করের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণপণে চীৎকার করছে সাহায্যের জন্য। শায়িত দেহটি থেকেও সে চীৎকার ধ্বনী অনেক সময় শুনতে পাওয়া যায়।

পূর্বে বলা হয়েছে, স্বপ্নে যে আত্মা মানুষটি অন্যত্র তার ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে তার একটা দেহও থাকে। তার সুখ-দুঃখ স্থুল দেহ বিশিষ্ট মানুষের সুখ-দুঃখের অনুরূপই। যেহেতু স্বপ্নাবস্থায় অথবা জাগ্রতাবস্থায় সুখ-দুঃখ আত্মারই দেহের না, দেহের কোন অংশকে ঔষধ প্রয়োগে অবশ করে দিয়ে আত্মার সংগে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে অংশটিকে ছুরি দিয়ে কর্তন করুন, তাতে আত্মার কোন অনুভূতিই হবে না।

বলা হয়েছে আত্মার সম্পর্ক অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতের সংগে। অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগত সীমাহীন এবং স্থুল জগতের বাইরের এক জগত। তাই স্বপ্নে আলমে বরযখে

অবস্থানকারী মৃত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয়। তার অর্থ এ নয় যে, মৃত ব্যক্তি বা তার আত্মা এ স্থূল জগতে প্রত্যপর্ণ করে।

স্বপ্নকালীন সুখ-দুঃখকে আমরা অলিক মনে করে ভুলে যাই জাগ্রত হবার পর। স্বপ্নকে অবাস্তব ও অসত্য মনে করা হয় তা ভেঙে যাবার পর। কিন্তু স্বপ্ন কোনদিন না ভাঙলেই তা হবে বাস্তব ও সত্য।

মৃত্যুর পর কবরে আত্মা মানুষটিরই সুখ-দুঃখ হতে পারে অথবা আমাদের ধারণার বিপরীত কোন পন্থায় নেক বান্দাদের সুখ ও পাপাত্মাদের দুঃখ হবে। সুখ-দুঃখ যখন আত্মারই, দেহের নয়, তখন মৃত্যুর পর সুখ-দুঃখ না হবার কি কারণ হতে পারে ?

নিদ্রা ও স্বপ্নের উল্লেখ প্রসংগে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তাহলো এই নিদ্রা বস্তুটি কি ? নিদ্রাকালে আত্মা কি দেহের সাথে জড়িত থাকে, না দেহচ্যুত হয় ? এ একটা প্রশ্ন বটে।

বিজ্ঞানী ও শরীর তত্ত্ববিদগণ কি বলবেন জানি না। কারণ তাঁদের কারবার তো বস্তু বা Matter নিয়ে—অদৃশ্য বিষয় নিয়ে নয়। অবশ্যি অনেক অদৃশ্য বস্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে ধরা পড়ে। কিন্তু আত্মার মতো বস্তু কি কখনো অণুবীক্ষণে ধরা পড়েছে ? আত্মা কেন, আত্মার যে অনুভূতি সুখ অথবা দুঃখ যন্ত্রণা তাও কি কোন যন্ত্রে দৃশ্যমান হয় কখনো ?

তাই প্রশ্ন নিদ্রাকালে আত্মা যায় কোথায় ? এবং কোথায় বিরাজ করে ? মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো বা কিছু বলবেন। কিন্তু সেও তো আন্দাজ অনুমান করে। তার সত্যতার প্রমাণ কি ? সত্য বলতে কি, এ এক অতীব দুর্বোধ্য ব্যাপার। সৃষ্টি রহস্যের এ এক উল্লেখ্য দিক সন্দেহ নেই। কুরআন হাকিম বলেছে ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ج

فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ

مُّسَمًّى ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

"আল্লাহ তায়ালা কবয বা দেহচ্যুত করে নেন ঐসব আত্মাকে তাদের মৃত্যুকালে এবং ঐসব আত্মাকেও যাদের মৃত্যু ঘটেনি নিদ্রাকালে। অতপর ঐসব আত্মাকে তিনি আটক রেখে দেন যাদের সম্পর্কে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট আত্মাগুলোকে একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন আছে।"

–(সূরা আয যুমার ঃ ৪২

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ج ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"তিনি রাত্রিবেলা তোমাদের রূহ কবয করেন। আর দিনের বেলা তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন। (রূহ কবয করার পর তিনি দ্বিতীয় দিনে) আবার তিনি তোমাদের সেই কর্মজগতে ফিরে পাঠান ; যেন জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হতে পারে। কেননা শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে। তোমরা কি কাজ কর ? তখন তিনি তোমাদেরকে তা বলে দেবেন।"-(সূরা আল আনয়াম ঃ ৬০)

এ দু'টো আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, মৃত্যুকালে আত্মা দেহচ্যুত হয়, এবং ঘুমন্তকালেও। তবে পার্থক্য এই যে, যাদের মৃত্যু সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তাদের আত্মা দেহে ফেরৎ পাঠানো হয় না। যাদের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত হয়নি, তাদের আত্মাগুলো নির্দিষ্টকালের জন্যে ফেরৎ পাঠানো হয়।

বুঝা গেল আত্মাকে দেহচ্যুত করলেই ঘুম আসে। তবে ঘুম সাময়িক। কারণ আত্মাকে আবার পাঠানো হয়। যার আত্মাকে ফেরৎ পাঠানো হয় না ; তাকে চূড়ান্ত মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এতে চিন্তাশীল লোকদের চিন্তার খোরাক আছে তাও বলে দেয়া হয়েছে প্রথম আয়াতটিতে।

অধ্যাপক আর্থার* এলিসন কুরআনের আয়াতগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, মৃত্যু ও ঘুম একই বস্তু যেখানে আত্মা দেহচ্যুত হয়। তবে ঘুমের বেলায় আত্মা দেহে ফিরে আসে এবং মৃত্যুর বেলায় আসে না-PARA PSYCHOLOGIC অধ্যয়নে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

তবে এই দেহচ্যুতির ধরন আলাদা। যে আত্মা চিরদিনের জন্যে দেহচ্যুত হচ্ছে, তার দেহচ্যুতির সময় মানুষ তা বুঝতে পারে এবং তার জন্যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

---

* অধ্যাপক আর্থার এলিসন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান। বৃটিশ সোসাইটি ফর সাইকোলজিক্যাল এন্ড স্পিরিচুয়াল স্টাডীজ-এর তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গিয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হন। তাঁর মুসলমানী নাম আবদুল্লাহ এলিসন।-গ্রন্থকার

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ٥

"এবং সত্যি সত্যিই মৃত্যুর যন্ত্রণা বা কাঠিন্য এসে গেল। (এ মৃত্যু এমন এক বস্তু) যার থেকে তুমি পালিয়ে থাকতে চেয়েছিলে।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ১৯)

আবার কচিৎ ও কদাচিৎ এর ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন সুস্থ ব্যক্তি নামায পড়ছে। সেজদারত অবস্থায় তার এবং অন্যান্যের অজ্ঞাতে তার মৃত্যু এসে যাচ্ছে। অথবা রাতে-খেয়ে দেয়ে আরামে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু সে ঘুম আর ভাঙছে না। এমন ঘটনাও শুনতে পাওয়া যায়। আমার আম্মা সুস্থ ও সবল অবস্থায় সারাদিনের কাজ-কর্মের শেষে রাতে এশার নামাযে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল নামায সেরে খাবেন। কিন্তু সেজদায় থাকাকালীন তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন।

মৃত্যুকালে আত্মা দেহচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে দেহের স্পন্দন, রক্ত চলাচল, সজীবতা আর বাকী থাকে না। কিন্তু নিদ্রাকালে এ সবই থাকে। আসলে নিদ্রা ও মৃত্যুকালে এই পার্থক্য তাও নির্ভর করে দেহ ও জীবনের মালিক আল্লাহরই সিদ্ধান্তের উপরে। মৃত্যুর সিদ্ধান্ত হলে দেহের অবস্থা একরূপ হয় এবং সিদ্ধান্ত না হলে দেহের অবস্থা অনেকাংশে স্বাভাবিক থাকে। এও আল্লাহর এক অসীম কুদরত তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এ একটা দৃষ্টান্তের সাহয্যে বুঝবার চেষ্টা করা যাক্। মনে করুন একটি লোক বাড়ী বদল করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সে তার বাড়ীর যাবতীয় আসবাবপত্র ঝাড়ু পাপোষ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তারপর একটা শূন্য গৃহ মাত্র পড়ে থাকে। কিন্তু সে যখন কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্যে অন্যত্র বেড়াতে যায় তখন তার বাড়ীর আসবাবপত্র আগের মতোই থাকে। থাকে না শুধু সে। মৃত্যু ঠিক তেমনি শুধু বাড়ী বদলই নয়, ইহলোক থেকে পরলোক বদলি বা স্থানান্তর। তারপর তার গৃহটির মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্ত চলাচল, দেহের সজীবতা, জ্ঞান, বিবেক, অনুভূতি শক্তি প্রভৃতি আসবাবপত্রের কোনটাই সে ফেলে যায় না। কিন্তু নিদ্রাকালে আত্মাটি তার গৃহের সমুদয় আসবাবপত্র রেখেই কিছুকালের জন্যে অন্যত্র চলে যায়।

আশা করি এ দৃষ্টান্তের পর ঘুম ও মৃত্যুর পার্থক্য বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়।

পরকালে শাফায়াত

শাফায়াত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ব্যতীত আখেরাতের আলোচনা পূর্ণাংগ হবে না বলে এখানে শাফায়াতের একটা মোটামুটি অথচ সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করা দরকার মনে করি।

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগত এবং তন্মধ্যস্থ যাবতীয় সৃষ্টি নিচয়ের স্রষ্টা। তিনি দুনিয়ারও মালিক এবং আখেরাতেরও মালিক। হুকুম শাসনের একচ্ছত্র মালিক যেমন তিনি, তেমনি পরকালে হাশরের মাঠে তাঁর বান্দাহদের আমলের হিসাব-নিকাশ করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একচ্ছত্র অধিকারও একমাত্র তাঁরই। তিনি বলেন ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط

"সেদিন (কিয়ামতের দিন) বাদশাহী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। তিনিই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।"–(সূরা হাজ্জ ঃ ৫৬)

অর্থাৎ সে দিনের বিচারে কারো সাহায্য গ্রহণ করার, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন জুরি বেঞ্চ বসাবার অথবা কারো কোন পরামর্শ গ্রহণ করার তাঁর কোনই প্রয়োজন হবে না। তিনি তো নিজেই সর্বজ্ঞ। প্রত্যেকের গোপন ও প্রকাশ্য আমল তাঁর জানা আছে। তদুপরি ন্যায় ও ইনসাফ প্রদর্শনের জন্যে বান্দাহর প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য আমল পুংখানুপুংখরূপে তাঁর ফেরেশতাগণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে আমলনামা হিসেবে রেকর্ড তৈরী করে রেখেছেন। এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে। সে আমলনামা দেখে পাপীগণ বিস্ময় প্রকাশ করে বলবে ঃ

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا ج

"বড়োই আশ্চর্যের বিষয় যে এ নামায়ে আমলে ছোট বড়ো কোন গুনাহই অলিখিত নেই।"–(সূরা কাহাফ ঃ ৪৯)

নামায়ে আমল ফেরেশতাগণের দ্বারা লিখিত। তাঁদের কোন ভুল হয় না। ভুল ও পাপ করার কোন প্রবণতাই তাঁদের নেই। কিন্তু তাই বলে কি আল্লাহ ফেরেশতা কর্তৃক লিখিত আমলনামার উপরে নির্ভরশীল ? কিছুতেই না। ফেরেশতাগণ তো বান্দাহকে যখন যে কাজ করতে দেখেছেন, তখনই তা লিখেছেন। বান্দাহদের ভবিষ্যৎ কাজ-কর্ম সম্পর্কে তাঁদের কোন জ্ঞান নেই। করতে দেখলেই তা শুধু লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু আল্লাহর কাছে অতীত ভবিষ্যৎ

সবই বর্তমান। বান্দাহর ভবিষ্যৎ কর্মও তাঁর কাছে বর্তমানের রূপ নিয়ে হাজির থাকে। অতএব ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা ব্যতিরেকেই তিনি তাঁর সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। কিন্তু ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে এবং বান্দাহর বিশ্বাসের জন্যে আমলনামা লিখার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। অতএব সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৃতীয় কোন পক্ষের কোন প্রয়োজন হলে খোদাকে তাঁর মহান মর্যাদা থেকে নীচে নামানো হবে। অন্য কেউ তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করবে অথবা বান্দাহর আমল আখলাক সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানদান করবে এ তো একজন মুশরিক চিন্তা করতে পারে। অতএব সেই বিচারের দিন কোন ব্যক্তির পরামর্শ বা সুপারিশ গ্রহণ তাঁর প্রয়োজন নেই।

مِّن قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط

"সেদিন আসার পূর্বে যে দিন না কোন লেন-দেন থাকবে, না কোন দুস্তি-মহব্বত, আর না কোন সুপারিশ।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৪)

কিন্তু বড়োই পরিতাপের বিষয় তওহীদ সম্পর্কে অনেকে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। তাদের ধারণা বরঞ্চ দৃঢ় বিশ্বাস যে, এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা হাশরের মাঠে পাপীদের জন্যে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বেহেশতে পাঠাবেন।

এ সুপারিশ তারা নিশ্চিত ও ফলপ্রসু বলে বিশ্বাস করে। অতএব খোদার বন্দেগী থেকে সুপারিশ তারা বেশী গুরুত্ব দেয়। এ গুরুত্বদানের একটি কারণ এই যে, সুপারিশকারী ব্যক্তিগণকে তারা খোদার অতি প্রিয়পাত্র, অতি নিকট ও অতি প্রভাবশালী মনে করে। এর অনিবার্য ফল এই হয় যে, প্রবৃত্তির মুখে লাগাম লাগিয়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস উপেক্ষা করে, ত্যাগ ও কুরবানী করে আল্লাহর হুকুম পালন করার পরিবর্তে তারা ঐসব লোককে তুষ্ট করার জন্যে অতিমাত্রায় অধীর হয়ে পড়ে যাদেরকে তারা সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্বাস করে নিয়েছে। অতএব তাঁদের সন্তুষ্টির জন্যে তাদেরকে নযর-নিয়ায দান করা তাদের নামে নযর-নিয়ায মানত করা, তাঁদের কবরে ফুল শির্নি দেয়া, কবরে গোলাপ ছড়ানো, বাতি দেয়া, মৃত বুযর্গানের নামে শির্নি বিতরণ করা প্রভৃতি কাজগুলো তাঁরা অতি উৎসাহে নিজেরা করে এবং অপরকে করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের বিশ্বাস এভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা যাবে। সন্তুষ্ট হলে অবশ্যই হাশরের মাঠে তাঁরা তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন। আর এ সুপারিশ কখনো মাঠে মারা যাবে না।

ইসলাম সম্পর্কে বুনিয়াদী ধারণা বিশ্বাসের অভাবেই এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিছু লোক ইসলামের মূল আকীদাহ মেনে নিয়ে তদনুযায়ী নিজকে

গড়ে তুলতে চায় না এবং মূলতঃই তারা দুষ্কৃতিকারী। আখেরাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা তাদের নেই। কুরআন ও হাদীস এবং নবী পাক (সা) ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবনের অনুকরণও তাদের কাম্য নয়। তাদের ধারণা আখেরাত যদি হয়ও—তাহলে সেখানে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য কোন সহজ পন্থা আছে কিনা। জ্বিন ও মানুষ শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দেয় যে, অমুক নামধারী কোন মৃত অলী তাদের শাফায়াতের কাজ করবেন। এ আশায় বুক বেঁধে তারা কোন মুসলমান বুযর্গের মাজারে অথবা কোন কল্পিত মাজারে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আবেদন-নিবেদন করে—যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য। এসব মাজারে গিয়ে যা কিছু করে তা মৃত ব্যক্তিদের জানারও কোন উপায় থাকে না। আর যখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একথা জানিয়ে দেবেন, তখন তারা মাজার পূজারীদের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে তাদের শির্কমূলক আচরণের জন্যে অত্যন্ত ব্যথিত হবেন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা মানুষকে খোদা বানাতে চায় অথবা তাদেরকে খোদার শরীক বানায় তাদের জন্যে বদদোয়া ব্যতীত কোন নেকলোকের পক্ষ থেকে দোয়া বা সুপারিশের আশা কিছুতেই করা যায় না।

তারপর দুনিয়ার তথাকথিত কিছু জীবিত অলীর কথা ধরা যাক। তাদের এখানে সমাজের অতি নিকৃষ্ট ধরনের দুষ্কৃতিকারীদেরও ভিড় হয়। তারা এ বিশ্বাসে তাদের নিকটে যায় যে, তারা খোদার দরবারে এতো প্রভাবশালী যে, কিয়ামতের দিন অবশ্যই তারা খোদাকে প্রভাবিত করে তাদের নাজাত লাভ করিয়ে দেবেন। এ আশায় তারা উক্ত পীর বা অলীকে নানান রকমের মূল্যবান নযর-নিয়ায দিয়ে ভূষিত করে।

এ নেহায়েৎ এক বিবেক সম্মত কথা যে, কিয়ামতে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে শাফায়াত করার মর্যাদা দান করবেন—তাঁরা নিশ্চিতরূপে বেহেশতবাসী হবেন। নতুবা যার নিজেরই নাজাতের কোন আশা নেই, সে এ সৌভাগ্য অর্থাৎ অন্যের সুপারিশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে কি করে? আর প্রকৃতপক্ষে কোন পীর অলী যদি সত্যিকার অর্থে নেক হন, তাহলে তিনি কি করে পাপাচারী দুষ্কৃতিকারীর বন্ধু হতে পারেন? কিয়ামতের দিন পাপাচারীদের কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না।

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ط

"অন্যায় আচরণকারীদের জন্যে কোন অন্তরংগ বন্ধুও থাকবে না এবং থাকবে না কোন সুপারিশকারী যার কথা শুনা যাবে।"

—(সূরা আল মুমেন ঃ ১৮)

কতিপয় তথাকথিত নামধারী পীর অলী সমাজ বিরোধী পাপাচারী লোকদের নিকট মোটা অংকের নজরানা ও মূল্যবান উপঢৌকন-হাদীয়ার বিনিময়ে তাদের চরিত্রের সংশোধনের পরিবর্তে পাপাচারেরই প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, তাদের নিজেদের নাজাতই অনিশ্চিত বরঞ্চ যালেমের সহযোগিতা করার জন্যে তারাও শাস্তির যোগ্য হবে।

এসব লোকের সম্পর্কেই কুরআন বলে ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ط كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ○

"(কিয়ামতের দিন) ঐসব নেতা, যাদের দুনিয়াতে অনুসরণ করা হয়েছিল, তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথাই প্রকাশ করবে—কিন্তু তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ও যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যারা এসব নেতাদের অনুসরণ করেছিল তারা বলবে হায়রে, যদি দুনিয়ায় আমাদেরকে একটা সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ যেভাবে এরা আমাদের প্রতি তাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করছে, আমরাও তাদের প্রতি আমাদের বিরাগ দেখিয়ে দিতাম। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে তাদের কৃত ক্রিয়াকর্ম এভাবে উপস্থাপিত করবেন যে, তারা দুঃখ ও অনুশোচনায় অভিভূত হবে। কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে বেরুবার কোন পথ পাবে না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৬-১৬৭)

পূর্ববর্তী উম্মতের ধর্মীয় নেতাগণ অর্থ উপার্জনের লালসায় এভাবে ধর্মের নামে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতো।

কুরআন বলে ঃ

إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

"অর্থাৎ (আহলে কিতাবদের) অধিকাংশ আলেম পীর-দরবেশ অবৈধ উপায়ে মানুষের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখে।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)

এসব পথভ্রষ্ট যালেমগণ তাদের ধর্মীয় মসনদে বসে ফতুয়া বিক্রি করে, অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে নযর-নিয়ায লুঠ করে এমন এমন সব ধর্মীয় নিয়ম-পদ্ধতি আবিষ্কার করে যার দ্বারা মানুষ তাদের কাছে আখেরাতের নাজাত খরীদ করে তাদেরকে খাইয়ে দাইয়ে তুষ্ট না করে তাদের জীবন মরণ, বিয়ে-শাদী প্রভৃতি হয় না এবং তাদের ভাগ্যের ভাঙা-গড়ার ঠিকাদার তাদেরকে বানিয়ে নেয়। এতটুকুতেই তারা ক্ষ্যান্ত হয় না, বরঞ্চ আপন স্বার্থের জন্যে এসব পীর-দরবেশ মানুষকে গোমরাহির ফাঁদে আবদ্ধ করে এবং যখন সংস্কার সংশোধনের জন্যে কোন হকের দাওয়াত দেয়া হয় তখন সকলের আগে এসব ধর্ম ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতারণার জাল বিস্তার করে হকের দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়।

পূর্ববর্তী উম্মতের আহলে কিতাবদের এ দৃষ্টান্ত পেশ করে আল্লাহ মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই তাদের অনুকরণে নিজেদের কৃত্রিম ধর্মীয় মসনদ জমজমাট করে রেখেছেন।

যারা নিজেরা স্বয়ং ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে রাজী নয় এবং ধর্মের নামে প্রতারণা করে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে তারাও নিজেদের নাজাতের জন্যেই পেরেশান থাকবে—অপরের সুপারিশ করার যোগ্যতাই বা তাদের কোথায় ?

শাফায়াতের ইসলামী ধারণা

তাই বলে শাফায়াত নামে কোন বস্তু ইসলামী আকায়েদের মধ্যে শামিল নেই কি ? হাঁ, নিশ্চয়ই আছে। তবে উপরে বর্ণিত শাফায়াতের মুশরেকী ধারণা কুরআন হাকিম বার বার খণ্ডন করে একটা ইসলাম সম্মত ধারণা পেশ করেছে। কিছু লোক হাশরের মাঠে কিছু লোকের শাফায়াত করবেন।

এ শাফায়াত হবে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। এতে করে আল্লাহর গুণাবলীর কণামাত্র লাঘব হবে না। না তাঁর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব কণামাত্র হ্রাস পাবে। সেদিনের শাফায়াত তাঁরই অনুমতিক্রমে এবং বিশেষ শর্তাধীন এবং সীমিত হবে। শাফায়াত হবে একটা বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী।

০ প্রথমতঃ শাফায়াতের ব্যাপারটি পুরাপুরি আল্লাহর হাতে এবং তাঁর মরযী মোতাবেক হবে।

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط

"বল, শাফায়াতের সমগ্র ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে।"–(সূরা যুমার ঃ ৪৪)

আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ কারো শাফায়াত করতে পারবে না।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ط

"তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কে তার কাছে শাফায়াত করবে ?"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

০ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ কাউকে শাফায়াতের অনুমতি দেবেন, শুধু সেই ব্যক্তির জন্যেই শাফায়াতকারী মুখ খুলতে পারবে।

وَلاَ يَشْفَعُوْنَ لا اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى

"যাদের উপর আল্লাহ খুশী হয়েছেন তারা ব্যতীত আর কারো জন্যে শাফায়াত করা যাবে না।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৮)

০ শাফায়াতকারী শাফায়াতের সময় যা কিছু বলবেন, তা সকল দিক দিয়ে হবে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত।

لاَّيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا○

"দয়ার সাগর আল্লাহ পাক যাদেরকে অনুমতি দেবেন, তারা ব্যতীত আর কেউ কোন কথা বলতে পারবে না এবং তারা যা কিছু বলবে, তা ঠিক ঠিক বলবে।"–(সূরা নাবা ঃ ৩৮)

উপরের শর্ত ও সীমারেখার ভেতরে যে শাফায়াত হবে, তা দুনিয়ার মানুষের দরবারে কোন সুপারিশের মতো নয়। তা হবে নেহায়েৎ বন্দেগীর পদ্ধতিতে অনুনয়-বিনয়, দোয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা। তাছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহর সিদ্ধান্ত পাল্টাবার জন্যে নয়, তাঁর জ্ঞান-বৃদ্ধি করার জন্যে নয় এমন কি এরূপ কোন সূক্ষ্মতম ধারণাও শাফায়াতকারীর মনে স্থান পাবে না। আখেরাতের একমাত্র মালিক ও বাদশাহর পরম অনুগ্রহসূচক অনুমতি পাওয়ার পর শাফায়াতকারী খুব দীনতা ও হীনতা সহকারে বলবে, "হে দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক ও বাদশাহ ! তুমি তোমার অমুক বান্দাহর গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দাও। তাকে তোমার মাগফেরাত ও রহমতের বেষ্টনীর মধ্যে টেনে নাও।"

এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শাফায়াতের অনুমতিদানকারী ও কবুলকারী যেমন আল্লাহ তেমনি শাফায়াতকারীও আসলে আল্লাহ স্বয়ং।

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلاَ شَفِيْعٌ.

"তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত তাদের জন্যে না আর কেউ অলী বা অভিভাবক আছে, আর না কেউ শাফায়াতকারী।"–(সূরা আল আনয়াম ঃ ৫১)

এ শাফায়াতকারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি হবেন, এবং কাদের জন্যে শাফায়াত করা হবে তা হাদীসসমূহে বলে দেয়া হয়েছে। শাফায়াতকারীগণ হবেন আল্লাহর নেক ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। আর ঐসব লোকের জন্যে করা হবে যাদের ঈমান ও আমল ওজনে এতটুকু কম হবে যে তা হবে ক্ষমার অযোগ্য। ক্ষমার যোগ্যতা লাভে কিছু অভাব রয়ে যাবে। এ অভাবটুকু পূরণের জন্যে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে তাদের জন্যে শাফায়াত করার অনুমতি দেবেন।

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার হলো যে, কারো ইচ্ছে মতো শাফায়াত করার এখতিয়ার কারো নেই। যাদের জন্যে শাফায়াত করা হবে তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়ার নিয়তেই কাউকে শাফায়াতের অনুমতি দেবেন।

তাহলে স্বভাবতঃই মনের মধ্যে এ প্রশ্ন জাগে যে, তাই যদি হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালাই যদি সব করবেন, তাহলে এ শাফায়াতের মাধ্যম নিযুক্ত করার হেতুটা কি ?

তার জবাব এই যে, আল্লাহ্ সেই মহাপরীক্ষার দিনে, যে দিনের ভয়ংকরতা দর্শনে সাধারণ মানুষ কেন নবীগণও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন এবং মহান প্রভুর দরবারে কারো কথা বলার সাহস ও শক্তি থাকবে না, সেদিন আল্লাহ্ তাঁর কিছু খাস ও প্রিয় বান্দাদেরকে শাফায়াতের অনুমতি দিয়ে তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ মর্যাদার সর্বোচ্চ স্থান হবে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সা)।

এ বিস্তারিত আলোচনায় একথা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শাফায়াত আসলে আল্লাহ্ তায়ালার এক বিশেষ ক্ষমা পদ্ধতির নাম যা ক্ষমার সাধারণ নিয়ম-কানুন থেকে কিছু পৃথক। একে আমরা ক্ষমা প্রদর্শনের অতিরিক্ত অনুগ্রহের নীতি (Special concessional laws of amnesty) বলতে পারি। এও একটা নীতি পদ্ধতি বটে। এটাও আল্লাহর তাওহীদ, প্রভুত্ব কর্তৃত্ব, সম্ভ্রম ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলীর পুরাপুরি চাহিদা মোতাবেক। এতে করে পুরস্কার অথবা শাস্তি বিধানের আইন-কানুন মোটেই ক্ষুণ্ন করা হয় না।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, আখেরাতের ক্ষমা প্রাপ্তি আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত মোটেই সম্ভব নয়। নবী বলেনঃ

اعلموا انه لا نجوا احدكم بعمله ـ (مسلم)

"জেনে রেখে দাও যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই শুধু তার আমলের বদৌলতে নাজাত আশা করতে পারে না।"-(মুসলিম)

কিন্তু একথা যেমন সত্য তেমনি এও সত্য যে, আল্লাহ তায়ালার এ অনুগ্রহ বা 'ফযল ও করম' একটা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবলমাত্র ঐসব লোকদেরকে তার ফযল ও করমের ছায়ায় স্থান দেবেন, যারা ঈমান ও আমলের বদৌলতে তার যোগ্য হবে। যে ব্যক্তির ঈমান ও আমল যতো ভালো হবে, সে তার ফযল ও করমের ততো হকদার হবে। আর যার ঈমান ও আমলের মূলধন যতো কম হবে সে তার অনুগ্রহ লাভের ততোটা কম হকদার হবে। আবার এমনও অনেক হতভাগ্য হবে যারা মোটেই ক্ষমার যোগ্য হবে না।

মোটকথা মাগফেরাত বাস্তবক্ষেত্রে নির্ভর করে মানুষের ঈমান ও আমলের উপরে। আর এ ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র আল্লাহ পাকের।

যা কিছু বলা হলো, তা হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে শাফায়াতের নির্ভুল ধারণা। উপরে বর্ণিত শাফায়াত সম্পর্কে ভ্রান্ত ও মুশরেকী ধারণা মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে ইসলামী ধারণা পোষণ না করলে আখেরাতের উপর ঈমান অর্থহীন হয়ে পড়বে।

মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার কোনকিছু শুনতে পায় কিনা

মৃত্যুর পর একটি মানুষ আলমে বরযখ নামে এক অদৃশ্য জগতে অবস্থান করে। এখন প্রশ্ন এই যে, তারা দুনিয়ার মানুষের কোন কথা-বার্তা, কোন স্তবস্তুতি, কোন প্রশংসাবাদ, কোন দোয়া ও কাকুতি-মিনতি শুনতে পায় কিনা।

এর জবাব কুরআন পাকে দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّيَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ○

"সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে—যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্তও তার জবাব দিতে পারে না। তারা বরঞ্চ এসব লোকের ডাকাডাকির কোন খবরই রাখে না।"—(সূরা আল আহকাফ ঃ ৫)

দুনিয়ার যেসব লোক তাদেরকে ডাকে, সে ডাক তাদের কাছে মোটেই পৌঁছে না। না তারা স্বয়ং সেসব ডাক তাদের নিজ কানে শুনে আর না কোন কিছুর মাধ্যমে তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে যে, কেউ তাদেরকে ডাকছে।

আল্লাহ তায়ালার এ এরশাদ বিশদভাবে বুঝতে হলে এভাবে বুঝতে হবে যে, দুনিয়ার যাবতীয় মুশরিক আল্লাহ ছাড়া যেসব সত্তাকে ডেকে আসছে তারা তিন প্রকারের। এক হচ্ছে, কিছু প্রাণহীন জড় পদার্থ যাদের স্বয়ং মানুষ নিজ হাতে তৈরী করে তাদেরকে উপাস্য বানিয়েছে।

দ্বিতীয়ত কতিপয় নেক ও বুযর্গ লোক যাঁরা অতীত হয়েছেন।

তৃতীয়ত ঐসব বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মানুষ যারা অপরকেও বিভ্রান্ত ও বিকৃত করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে।

প্রথম ধরনের উপাস্য সম্পর্কে একথাতো সুস্পষ্ট যে, প্রাণহীন জড় পদার্থ হওয়ার কারণে না তারা কিছু শুনতে ও দেখতে পায়, আর না তাদের কোন কিছু করার কোন শক্তি আছে।

দ্বিতীয় ধরনের উপাস্যগণও অর্থাৎ মৃত্যুবরণকারী নেক ও বুযর্গগণও দু' কারণে দুনিয়ার মানুষের ফরিয়াদ ও দোয়া প্রার্থনা থেকে বেখবর থাকবেন। এক এই যে, তাঁরা আল্লাহর নিকটে এমন এক অবস্থায় রয়েছেন যেখানে দুনিয়ার মানুষের কোন আওয়াজ সরাসরি পৌঁছে না, দুই—আল্লাহ ও তাঁর

ফেরেশতাগণও তাঁদের কাছে দুনিয়ার কোন খবর পৌছিয়ে দেন না। তার কারণ এই যে, যারা জীবনভর মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দরবারে দোয়া করা শিক্ষা দিয়ে এলেন, তাদেরকেই এখন মানুষ ডাকছে—এর চেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় তাদের কাছে আর কিছু হবে না। আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাহদের রূহে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া কিছুতেই পছন্দ করেন না।

তৃতীয় প্রকারের উপাস্যদেরও বেখবর থাকার দু'টি কারণ আছে। এক এই যে, তারা আসামী হিসেবে আল্লাহর হাজতে রয়েছে যেখানে দুনিয়ার কোন আওয়াজই পৌছে না। তাদের মিশন দুনিয়াতে খুব সাফল্য লাভ করছে এবং মানুষ তাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে—আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ একথা তাঁদের পৌছিয়ে দেন না।

এমন খবর তাদেরকে জানিয়ে দিলে—তা তাদের জন্যে খুবই আনন্দের কারণ হবে। আর আল্লাহ এসব যালেমদেরকে কখনো সন্তুষ্ট করতে চান না।

এ প্রসঙ্গে একথা বুঝে নেয়া উচিত যে, দুনিয়াবাসীর সালাম এবং দোয়া তাঁর নেক বান্দাহদের কাছে পৌছিয়ে দেয়া হয়। কারণ এটা তাঁদের জন্যে আনন্দের বিষয় হবে।

ঠিক তেমনি পাপাচারী-অপরাধীদেরকে আল্লাহ দুনিয়াবাসীর অভিশাপ, লাঞ্ছনা, ভৎর্সনা, গালি প্রভৃতি শুনিয়ে দেন। এতে তাদের মনকষ্ট আরও বাড়ে।

হাদীসে আছে বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধে নিহত কাফেরদেরকে নবী করিমের ভৎর্সনা শুনিয়ে দেয়া হয়, কারণ এ তাদের মনঃকষ্টের কারণ হয়। কিন্তু নেক বান্দাহদের মনঃকষ্টের কারণ হয় এবং পাপীদের সন্তুষ্টির কারণ হয় এমন কিছু তাদের কাছে পৌছানো হয় না।

মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার কোন কিছু জানতে ও শুনতে পারে কিনা এ সম্পর্কে উপরের আলোচনায় এ সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হবে বলে মনে করি।

বেশ কিছু কাল আগে আজমীরে খাজা সাহেবের মাজার জিয়ারতের পর আমার জনৈক গায়ক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমরা যেমন আল্লাহ তায়ালার দরবারে বহু কিছু চাই, কাকুতি-মিনতি করি, কান্নাকাটি করি, তেমনি কিছু লোককে দেখলাম মরহুম খাজা সাহেবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে বহু কিছু চাইছে। কেউ তাঁর মাজারে কাওয়ালী গান করছে। ইসলামে এসব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, আপনি কি মনে করেন ?

তিনি বললেন, আর যাই হোক, তাঁর মাজারে গান গাওয়া নিষিদ্ধ হলে তিনি তো নিষেধ করে দিতেন, অথবা তাঁর বদদোয়া লাগতো, তাতো কারো হয়নি, তাছাড়া তিনি কাওয়ালী গান ভালোবাসতেন।

বন্ধুটি প্রথম কথাগুলোর জবাব এড়িয়ে গেলেন, তবে তাঁর মাজারে কাওয়ালী গান গাইলে তিনি তা শুনেন এবং খুশী হন—এমন ধারণা বিশ্বাস বন্ধুটির ছিল। উপরের আলোচনায় বন্ধুটির এবং অনেকের এ ধরনের ধারণা বিশ্বাসের খণ্ডন হবে বলে মনে করি। আল্লাহর অনেক অলী দরবেশকে অসীম ক্ষমতার মালিক মনে করে তাঁদের কাছে বহু কিছু চাওয়া হয়। অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ, কোন শক্তি বা সত্তা, মানুষের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। একথা কুরআন পাকের বহু স্থানে বলা হয়েছে।

মজার ব্যাপার এই যে, এবং শয়তানের বিরাট কৃতিত্ব এই যে, যাঁরা সারা জীবন তৌহীদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন, মৃত্যুর পর তাঁদেরকে মানুষ খোদা বানিয়ে দিয়েছে।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, (হে আবদুল কাদের ! আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দাও) তার মৃত্যুর পর তাঁকে সম্বোধন করে এ কথা বলাও শির্ক হবে, কিন্তু কাদেরীয়া তরীকার প্রসিদ্ধ খানকার বাইরের দেয়ালের গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে উপরের কথাগুলো লেখা থাকতে দেখেছি। তাঁর নামেও বহু শির্ক প্রচলিত আছে। কিন্তু তিনি এবং তাঁর মতো অনেকেই মোটে জানতেই পারেন না যে, অজ্ঞ মানুষ তাঁদেরকে খোদা বানিয়ে রেখেছে।

কারো কারো এমন ধারণা বিশ্বাসও রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা দুনিয়ায় যাতায়াত করে, এ ধারণা সত্য হলে উপরের কথাগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়। খাজা আজমীরি এবং হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) তাহলে স্বয়ং দেখতে পেতেন যে মানুষ তাঁদেরকে খোদা বানিয়ে রেখেছে এবং এটা তাঁদের জন্যে ভয়ানক মনঃকষ্টের কারণ হতো। আর আল্লাহ তা কখনো পছন্দ করেন না। অতএব আলমে বরযখ থেকে দুনিয়ায় ফিরে আসার কোনই উপায় নেই।

একটা ভ্রান্ত ধারণা

পরকালে সৎ ও পুণ্যবান লোকই যে জয়যুক্ত হবে তা অনস্বীকার্য। অমুসলমানদের মধ্যে অনেকে বহু প্রকারের সৎকাজ করে থাকেন। সত্য কথা বলা, বিপন্নের সাহায্য করা, অন্যের মংগল সাধনের জন্যে অর্থ ব্যয় ও ত্যাগ স্বীকার করা, বহু জনহিতকর কাজ করা প্রভৃতি কাজগুলো অন্য ধর্মের লোকদের মধ্যেও দেখা যায়। তারা আল্লাহর তওহীদ ও দ্বীনে হকে বিশ্বাসী না হলেও তাদের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী পাওয়া যায়। বর্ণিত কাজগুলো যে পুণ্য কাজ তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অতএব পরকালে বিচারে তাদের কি হবে?

অনেকের বিশ্বাস তাদের সৎকাজের পুরস্কার স্বরূপ তারাও স্বর্গ বা বেহেশত লাভ করবেন। এ বিশ্বাস বা ধারণা কতখানি সত্য তা একবার যাচাই পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝

"এবং যে নেক কাজ করবে, সে পুরুষ হোক অথবা নারী, তবে যদি সে মুমেন হয়, তাহলে এসব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কণামাত্র জুলুম করা হবে না (অর্থাৎ তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে না)।"–(সূরা আন নিসা : ১২৪)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

"যে ব্যক্তিই নেক কাজ করবে—সে পুরুষ হোক বা নারী হোক—তবে শর্ত এই যে, সে মুমেন হবে—তাহলে দুনিয়াতে তাকে পূত-পবিত্র জীবনযাপন করার এবং (আখেরাতে) এমন লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব।"–(সূরা আন নাহল : ৯৭)

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

"এবং যে নেক আমল করবে—পুরুষ হোক বা নারী হোক এবং যদি মুমেন হয়, তাহলে এমন লোক সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে যেখানে তাদেরকে অগণিত জীবিকা সম্ভার দান করা হবে।"

–(সূরা আল মুমেন ঃ ৪০)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে নেক কাজের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক বারেই এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, নেক আমলকারীকে অবশ্যই মুমেন হতে হবে। ইসলামের বুনিয়াদী আকীদাগুলোর প্রতি ঈমান আনার পরই নেক কাজের পুরস্কার পাওয়া যাবে।

কুরআন পাকের বহুস্থানে এভাবে কথা বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ـ

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে—অর্থাৎ ঈমান নেক আমলের পূর্ব শর্ত। আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রসূল এবং আখেরাত প্রভৃতির উপর প্রথমে ঈমান আনতে হবে। অতপর সৎকাজ কি কি তাও বলে দেয়া হয়েছে। এ সৎকাজগুলো আল্লাহর নবী-রসূলগণ বাস্তব জীবনে স্বয়ং দেখিয়েছেন। তাদের বলে দেয়া পন্থা পদ্ধতি অনুযায়ী সে কাজগুলো করতে হবে। এ কাজের লক্ষ্য হবে, যাঁকে স্রষ্টা, রিযিকদাতা, মালিক, প্রভু, বাদশাহ ও শাসক হিসেবে মেনে নেয়া হলো (যার অর্থ ঈমান আনা), তাঁর সন্তুষ্টিলাভের জন্যেই সেসব নেক কাজ করা হবে। পুরস্কার দেয়ার একমাত্র অধিকার যাঁর তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর সন্তুষ্টিলাভের ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে পুরস্কার আসবে কোথা থেকে ? সে জন্যে পরকালীন মুক্তি ও পুরস্কার নির্ভর করছে নেক আমলের উপর এবং নেক আমল ফলদায়ক হবে ঈমানের সাথে।

একথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, বিশ্বজগত ও তার প্রতিটি সৃষ্টিকণার স্রষ্টা ও মালিক প্রভু একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ? মানুষকে তার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছুই দিয়েছেন সেই আল্লাহ। জীবনে উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে সুখ স্বাচ্ছন্দের ও নব নব উদ্ভাবনী কাজের সকল সামগ্রী ও উপাদান তিনি তৈরী করেছেন। জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক, কর্মশক্তি, প্রখর উদ্ভাবনী শক্তি দিয়েছেন তিনি। তিনিই মানুষের জন্যে পাঠিয়েছেন দ্বীনে হক বা সত্য সুন্দর ও মংগলকর জীবন বিধান। মানুষকে সদা সৎপথে পরিচালিত করার জন্যে এবং তাদের নৈতিক শিক্ষার জন্যে পাঠিয়েছেন যুগে যুগে নবী ও রসূলগণকে। তিনিই ইহজগতের ও পরজগতের স্রষ্টা ও মালিক প্রভু। বিচার দিনের একচ্ছত্র মালিক এবং বিচারকও তিনি। এমন যে আল্লাহ, তাঁর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও আনুগত্য অস্বীকার করা হলো। অস্বীকার করা হলো তাঁর নবী-রসূল ও আখেরাতের বিচার দিবসকে। স্রষ্টা প্রভু

ও প্রতিপালক আল্লাহর স্তবস্তুতি, আনুগত্য দাসত্ব, করার পরিবর্তে করা হলো তাঁরই কোন সৃষ্টির অথবা কোন কল্পিত বস্তুর। উপরে অমুসলিম সৎ ব্যক্তির গুণের মধ্যে একটি বলা হয়েছে সত্যবাদিতা। কিন্তু সত্য দ্বীনকে অস্বীকার করার পর এবং দয়ালু স্রষ্টা প্রভু ও প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করার পর সত্যবাদিতার কানাকড়ি মূল্য রইল কি ?

দ্বিতীয়ত তাদের বদান্যতা, জনহিতকর কাজ এবং দান খয়রাতের মতো গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চিন্তা করুন, অর্থ-সম্পদ, জনহিতকর কাজের যাবতীয় সামগ্রী, জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মশক্তি সবই আল্লাহর দান। একদিকে দানের বস্তু দিয়ে অপরের সাহায্য করা হলো এবং প্রকৃত দাতার আনুগত্য, দাসত্ব ও কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করা হলো। এ যেন পরের গরু পীরকে দান। এ দানের কি মূল্য হতে পারে ?

স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর আনুগত্যে মস্তক অবনত করা এবং তাঁরই স্তবস্তুতি ও এবাদত-বন্দেগী অস্বীকার করা কি গর্ব-অহংকার এবং কৃতঘ্নতার পরিচায়ক নয় ? এটাকি চরম ধৃষ্টতা, নিমকহারামী ও বিশ্বাসঘাতকতা নয় ? উপরন্তু এবাদত-বন্দেগী, দাসত্ব-আনুগত্য করা হলো আল্লাহরই অন্যান্য সৃষ্টির। সৃষ্টিকে করা হলো স্রষ্টার মহিমায় মহিমান্বিত। এর চেয়ে বড় ধৃষ্টতা এর চেয়ে বড় অন্যায় ও যুলুম আর হতে পারে কি ? তাই আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ط لاَيَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَىْءٍ ط ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ

"যারা খোদার দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, তাদের সৎকাজগুলো হবে ভস্মস্তুপের ন্যায়। ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে প্রচন্ড বায়ু বেগে সে ভস্মস্তুপ যেমন শূন্যে উড়ে যাবে, ঠিক সে সৎকাজগুলোর কোন অংশেরই বিনিময় তারা লাভ করবে না। কারণ খোদার দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাস তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিল।"

—(সূরা ইবরাহীম ঃ ১৮)

অর্থাৎ যারা আপন প্রভু আল্লাহর সাথে নিমকহারামী, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা ও পাপাচারের আচরণ করেছে এবং দাসত্ব-আনুগত্য ও এবাদত বন্দেগীর সেসব পন্থা অবলম্বন করতে অস্বীকার করেছে—যার দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, তাদের জীবনের পরিপূর্ণ কার্যকলাপ এবং সারা জীবনের আমল-আখলাকের মূলধন অবশেষে এমন ব্যর্থ ও অর্থহীন হয়ে পড়বে, যেন একটা বিরাট ভস্মস্তুপ ধীরে ধীরে জমে

উঠে পাহাড় পর্বতের আকার ধারণ করেছে। কিন্তু একটি দিনের প্রচণ্ড বায়ুতে তার প্রতিটি ভস্মকণা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। তাদের প্রতারণামূলক সুন্দর সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচার তাদের বিস্ময়কর শিল্পকলা ও স্থাপত্য শিল্প, বিরাট বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ললিতকলা, প্রভৃতি অনন্ত সম্ভার এমন কি তাদের উপাসনা-আরাধনা, প্রকাশ্য সৎকাজগুলো, দান-খয়রাত ও জনহিতকর কার্যাবলী একটা বিরাট ভস্মস্তুব বলেই প্রমাণিত হবে। তাদের এসব গর্ব অহংকারের ক্রিয়াকলাপ আখেরাতের বিচার দিনে বিচারের দাঁড়িপাল্লায় কোনই ওজন বা গুরুত্বের অধিকারী হবে না।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

“তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের সকল সৎকাজ-গুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।”−(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৭)

দ্বীন ইসলামে যারা অবিশ্বাসী তাদেরই সৎকাজগুলো শুধু বিনষ্ট হবে না, বরঞ্চ দ্বীন ইসলামে বিশ্বাসস্থাপন করার পর যারা তা পরিত্যাগ করবে, তাদের পরিণামও অবিশ্বাসী কাফেরদের মতো হবে।

মোটকথা কুরআন হাকীমের প্রায় পাতায় পাতায় একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারাই আল্লাহর প্রেরিত দ্বীনে হক গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তারা এ দুনিয়ায় কোন ভালো কাজ করুক আর না করুক, তাদের স্থান হবে জাহান্নামে।

আল্লাহ ও রসূলকে যারা অস্বীকার করে, পরকালে পুরস্কার লাভ যদি তাদের একান্ত কাম্য হয়, তবে তা দাবী করা উচিত তাদের কাছে যাদের পূজা ও স্তবস্তুতি তারা করেছে, যাদের হুকুম শাসনের অধীনে তারা জীবন যাপন করেছে, যাদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব তারা মেনে নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত সেদিন কোন শক্তিমান সত্তা থাকবে কি যে কাউকে কোন পুরস্কার অথবা শাস্তি দিতে পারে ? বেহেশতের দাবী দাওয়া নিয়ে কোন শ্লোগান, কোন বিক্ষোভ মিছিল করার কারো ক্ষমতা, সাহস ও স্পর্ধা হবে কি ? তাছাড়া পুনর্জীবন, পরকাল, হিসাব-নিকাশ, দোযখ-বেহেশত যারা অবিশ্বাস করলো, সেখানে কিছু পাবার বা তার জন্যে তাদের বলারই বা কি আছে ?

অতএব খোদাদ্রোহী ও খোদাবিমুখ অবিশ্বাসীদের সৎকাজের কোনই মূল্য যদি পরকালে দেয়া না হয়, তাহলে তা হবে পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তবে হাঁ, তারা দুনিয়ার বুকে কোন ভালো কাজ করে থাকলে তার প্রতিদান এ দুনিয়াতেই তারা পাবে। মৃত্যুর পরে তাদের কিছুই পাওনা থাকবে না।

৺

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের পার্থিব সুফল

প্রতিটি মানুষ, যে কোন দেশের যে কোন জাতির হোক না কেন, শান্তির জন্যে লালায়িত। এ শান্তি স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে নিশ্চিন্তে নিরাপদে বসবাস করার, নিশ্চয়তার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার, মৌলিক অধিকার ভোগ করার আপন অধিকারের উপরে অপরের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকার মধ্যে নিহিত। আর এ শান্তি নিহিত নিজস্ব আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর জীবন গড়ে তোলার স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধার মধ্যে। এর কোন একটি বাধাগ্রস্ত হলে অথবা কোন একটির নিশ্চয়তার অভাব ঘটলেই শান্তি বিঘ্নিত হয়।

কিন্তু এ শান্তি মানব সমাজে কোথাও আছে কি ? কোথাও তা মোটেই নেই এবং কোথাও থাকলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে। আপনার পরিবারের মধ্যে যদি আদর্শের লড়াই না হয় অথবা চরম মতানৈক্যের ঝড় না বয়, আপনার আবাস গৃহের সীমানার মধ্যে যদি কখনো চোর বদমায়েশের আনাগোনা না হয়, আপনার মাঠের সবটুকু ফসল যদি নিরাপদে ঘরে তুলতে পারেন, আপনার চাকর-বাকর আপনার বাজার সওদা করতে গিয়ে যদি কানাকড়িও আত্মসাৎ না করে অথবা বাইরের ষড়যন্ত্রে আপনার জান-মালের উপর হাত না দেয়, তাহলে আলবৎ বলা যাবে যে, আপনি শান্তিতে বাস করছেন। কিন্তু আজ কাল সর্বত্রই এর উল্টোটা দেখা যায় তাই শান্তি কোথাও নেই।

আমাদের সমাজটার কথাটাই ধরুন। চরম নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে সমাজের সর্বস্তরে চরম দুর্নীতির ব্যধি মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। আপামর জনসাধারণের মধ্যে দুর্নীতি, শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে দুর্নীতি, সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের মধ্যে দুর্নীতি। মসজিদে জুতা চুরি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি ব্যাপক হারে চলছে। দুর্নীতি দুষ্কৃতি দমনের জন্যে যেসব সংস্থা কার্যরত আছে তাদের মধ্যে দুর্নীতি। যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াবেন তার মধ্যেই ভূত আত্মগোপন করে আছে। যার ফলে আইন শৃংখলা ভেঙে পড়েছে। তাই মজলুম ব্যক্তি কোন সুবিচার পায় না, ক্ষমতাসীন ধনবান ও সমাজ বিরোধীরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাদের কু-মতলব হাসিল করে।

তারপর দেখুন আজকাল দেশে দেশে চরম সন্ত্রাস দানা বেঁধে উঠেছে। খুন রাহাজানি ছিনতাই (বিমান ছিনতাইসহ) নির্মম হত্যাকাণ্ড, ডিনামাইট ও নানাবিধ বিস্ফোরক দ্রব্যাদির সাহায্যে দালান কোঠা বাড়ি ঘর উড়িয়ে দেয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বাড়িতে, শিক্ষাংগনে, রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের ইজ্জত আবরু এমনকি জীবনটা পর্যন্ত আজ আর নিরাপদ নয়।

একটি শক্তিশালী দেশ অন্য একটি দেশের উপর সশস্ত্র আগ্রাসন চালিয়ে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। লক্ষ লক্ষ নর-নারী নির্মমভাবে হত্যা করছে। একটির পর একটি গ্রাম ও শস্যক্ষেত জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মানুষের কংকাল থেকে শুধু উঠছে হাহাকার আর্তনাদ। এ জুলুম নিষ্পেষণের কোন প্রতিকার নেই। গোটা মানবতা আজ অসহায়।

এসবের প্রতিকার কারো কাছে আছে কি ? এইতো সেদিন বৈরূতে আমেরিকার দূতাবাস ভবনটি সন্ত্রাসবাদীরা উড়িয়ে দিল। জান-মালের প্রচুর ক্ষতি হলো। দক্ষিণ কোরিয়ার যাত্রীবাহী বিমান রাশিয়ার ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হলো। কয়েক শ' নিরপরাধ আদম সন্তান প্রাণ হারালো। রাশিয়া গায়ের জোরে আফগানিস্তান দখল করে আফগানদের ভিটেমাটি উজাড় করে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, প্রাণের ভয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহ হারা হয়েছে। তাদের হাহাকার আর্তনাদ দুনিয়ার মানুষকে ব্যথিত করেছে। গোটা লেবাননকে ইসরাঈল কারবালায় পরিণত করেছে। কিন্তু কোন প্রতিকার হলো কি ? এ ধরনের লোমহর্ষক ঘটনা তো নিত্য নতুন ঘটছেই সারা দুনিয়া জুড়ে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে ক্যাস্‌পার ওয়াইনবার্গার কিছু বলতে পারেননি, বলবেন বা কি ? আঘাতের প্রত্যুত্তরে যদি আঘাত দেয়া হয় তাহলে বৃহত্তর আঘাতের প্রতীক্ষা করতে হবে। অন্যায় আঘাতের মনোভাব দূর করা যায় কি করে ? সমাজ বিরোধী, দুষ্কৃতিকারী, দস্যুতস্কর, লুটেরা, সন্ত্রাসবাদী প্রভৃতি মানব দুশমনদের চরিত্র সংশোধনের কোন ফলপ্রসু পন্থা পদ্ধতি আধুনিক সভ্যতার সমাজ ও রাষ্ট্রপতিদের জানা আছে কি ? নেই—মোটেই নেই। আঘাত হানার জন্যে এবং আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা শুধু অস্ত্রনির্মাণ প্রতিযোগিতাই করতে জানে। মানুষের চরিত্র সংশোধনের কোন অস্ত্রই তাদের কাছে নেই।

এ অস্ত্র শুধু ইসলামের কাছেই রয়েছে। এ অস্ত্র আল্লাহ পাঠিয়েছেন নবী-রসূলগণের মাধ্যমে মানবজাতির জন্যে। সে অস্ত্র হলো একটা বিশ্বাস। একটা দৃঢ় প্রত্যয় যার ভিত্তিতে মন মানসিকতা, চরিত্র, রুচি ও জীবনের মূল্যবোধ গড়ে তোলা হয়। যে বিশ্বাস একটা জীবন দর্শন পেশ করে, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষা দেয়, জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা দেয়, জীবনকে অর্থ-বহ করে এক অদৃশ্য শক্তির কাছে প্রতিটি কাজের জন্যে জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করে। যে বিশ্বাস এ শিক্ষা দেয় যে—সৃষ্টিজগত ও তার মধ্যেকার মানুষকে উদ্দেশ্য বিহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করার পর তাকে এখানে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, সে এখানে যা খুশী তাই করবে, যে কোন

ভালো কাজ করলে তার পুরস্কার দেবারও কেউ নেই—এবং অসৎ কাজ করলে তার জন্যে কেউ শাস্তি দেবারও নেই। আসল কথা—যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, মরণের পর তাঁর কাছেই তাকে ফিরে যেতে হবে। তারপর তার দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি ভালোমন্দ কাজের হিসেব তাঁর কাছে দিতে হবে। দুনিয়ার জীবনে কারো অন্যায় করে থাকলে দুষ্কৃতিকারী হলে, সন্ত্রাসবাদী হয়ে মানুষের জীবন ও ধন-সম্পদ ধ্বংস করলে তার সমুচিত শাস্তি তাকে পেতেই হবে। শাস্তিদাতার শাস্তিকে ঠেকাবার কোন শক্তিই কারো হবে না সেদিন। তখনকার শাস্তি হবে চিরন্তন। কারণ তখনকার জীবনেরও কোন শেষ হবে না, মৃত্যু আর কোনদিন কাউকে স্পর্শ করবে না। এটাই হলো পরকালের বিশ্বাস। সেদিনের শাস্তি অথবা পুরস্কার দাতা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যিনি দুনিয়ারও স্রষ্টা, মানুষসহ সকল জীব ও বস্তুরও স্রষ্টা, পরকালেরও স্রষ্টা ও মালিক প্রভু।

একমাত্র এ বিশ্বাসই মানুষকে মানুষ বানাতে পারে, নির্দয় পাষণ্ডকে স্নেহময় ও দয়াশীল বানাতে পারে। চরিত্রহীনকে চরিত্রবান, দুষ্কৃতিকারী লুটেরাকে বানাতে পারে—মানুষের জীবন ও ধন-সম্পদের রক্ষক। সন্ত্রাস- বাদীকে বানাতে পারে—মানবদরদী ও মানবতার বন্ধু, দুর্নীতিবাজকে করতে পারে দুর্নীতি নির্মূলকারী। সৃষ্টির সপ্তম শতাব্দীতে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাই ঘটেছিল আরবের নবী মুহাম্মদ মুস্তফার (সা) নেতৃত্বে। নবী (সা) আল্লাহর প্রতি তাঁর যাবতীয় গুণাবলীসহ বিশ্বাস সৃষ্টি করেন পাপাচারী মানুষের মধ্যে, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ও জবাবদিহির অনুভূতিও সৃষ্টি করেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের চরিত্র সংশোধন করেন। দুর্ধর্ষ রক্তপিপাসু একটা জাতিকে মানবতার কল্যাণকামী জাতিতে পরিণত করেন। তাদেরকে দিয়ে এক সত্যিকার কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলেন। ভ্রাতৃত্ব, স্নেহ-ভালোবাসা, পর দুঃখ-কাতরতা ও প্যারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার সুদৃঢ় বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করেন। সমাজ থেকে সকল অনাচার দূর হয়ে যায়। এমন এক সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে যা ইতিপূর্বে দুনিয়া কোনদিন দেখতে পায়নি। তেমন সমাজব্যবস্থা আজও দুনিয়ার কোথাও নেই।

আজ যদি পরাশক্তিগুলো ও তাদের আর্শীবাদপুষ্ট রাষ্ট্রগুলো খোদা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো এবং অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তা যদি মানবতার সেবায় লাগাতো তাহলে এক নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি হতো। খোদা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফার (সা) আদর্শিক নেতৃত্বের অধীন যদি সর্বত্র পথহারা মানুষ তাদের চরিত্র গড়ে তোলে, তাহলে সর্বত্র মানুষের রক্তে হোলিখেলা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রত্যেকে তার জান-মাল নিরাপদ মনে করবে, দুর্নীতির মানসিকতা দূর হয়ে

যাবে। প্রশাসন ব্যবস্থা আইন-শৃংখলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-আচার সবকিছুই চলতে থাকবে সঠিকভাবে এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিজেই আইন ভংগ করবে না। দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করবে না। রাষ্ট্রীয় সম্পদ কেউ আত্মসাৎ করবে না, কেউ কাউকে প্রতারণা করবে না। অস্ত্রের সাহায্যে কেউ জাতির ঘাড়ে ডিক্টেটর হয়ে বসবে না। মজলুমের কণ্ঠ কখনো স্তব্ধ হয়ে যাবে না, কাউকে গোলামির শৃংখলে আবদ্ধ হতে হবে না, অন্ন-বস্ত্রের অভাবে কোথাও হাহাকার শুনা যাবে না, চিকিৎসার অভাবে কাউকে রোগ যন্ত্রণায় কাতরাতে হবে না। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের এসবই হলো পার্থিব মংগল ও সুফল। ক্ষমতা গর্বিত লোকেরা স্বৈরাচারী শাসকরা, খোদা ও আখেরাতে অবিশ্বাসী জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক-বাহক ও মানসিক গোলামরা যদি এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে, তাহলেই গোটা মানবতারই মংগল হতে পারে।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে যে সন্তানের জন্ম হয়, তাকে পিতা ও মাতা সবচেয়ে ভালোবাসে। সন্তানের কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট মা-বাপের সহ্য হয় না। সন্তান কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লে মা-বাপ অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়ে। তবে একথা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সাধারণত পিতার চেয়ে মায়ের কাছে সন্তান অধিকতর ভালোবাসার বস্তু। চরম ও পরম স্নেহ আদরের এ প্রিয়তম আকাংখিত বস্তু লাভ করার জন্যে মা তাকে গর্ভে ধারণ করার কষ্ট ও প্রসবকালীন চরম যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় ও হাসিমুখে বরণ করে। এ যন্ত্রণা মৃত্যু যন্ত্রণার মতোই। এ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অনেকেই মৃত্যু বরণও করে। তথাপি পর পর গর্ভ ধারণ করতে কেউ অস্বীকৃতি জানায় না। অতীব জ্বালা যন্ত্রণার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার দিকে তাকাতেই মায়ের সকল দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়ে যায় এবং তার স্বর্গীয় আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে। এ সন্তান তার সবচেয়ে ভালোবাসার বস্তু হওয়ারই কথা।

সন্তানের সাথে পিতার রক্ত মিশে আছে বলে সেও পিতার সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র। তাই স্বভাবতঃই মা এবং বাপ তাদের সন্তানদের সুখী ও সুন্দর জীবনযাপনই দেখতে চায়। সন্তানকে সুখী করার জন্যে চেষ্টা-চরিত্রের কোনরূপ ত্রুটি পিতা-মাতা করে না। উপার্জনশীল পিতা তাদের জন্যে জমি-জেরাত করে দালান কোঠা তৈরী করে ব্যাংক বেলান্স রেখে যায় যাতে করে তারা পরম সুখে জীবনযাপন করতে পারে।

কাজ যদি তাদের এতোটুকুই হয় তাহলে বুঝতে হবে জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা ভ্রান্ত অথবা অপূর্ণ। দুনিয়ার জীবনটাই একমাত্র জীবন নয়, বরঞ্চ গোটা জীবনের একটা অংশ। দুনিয়ার পরেও যে জীবন আছে এবং সেটাই যে আসল জীবন তারই পূর্ণাংগ আলোচনাই তো এ গ্রন্থে করা হয়েছে।

তাহলে একথাই মানতে হবে যে, সন্তানের জীবনকে যারা সুখী ও দুঃখ-কষ্টের উর্ধ্বে দেখতে চায় তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের পরের জীবনটা সম্পর্কেও অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কিন্তু যারা পরকাল আছে বলে স্বীকার করেন, তাদের মধ্যে শতকরা কতজন সন্তানের পরকালীন চিরন্তন জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন? সন্তানের ভালো চাকুরী, গাড়ি, বাড়ি, দু' হাতে অঢেল কামাই, নাম-ধাম ইত্যাদি হলেই তো পিতা-মাতা খুশীতে বাগ বাগ

হয়ে যায়। তারা ভেবে দেখে না ছেলেরা কামাই রোজগার কিভাবে করছে। জীবন কোন্ পথে পরিচালিত করছে। একজন সত্যিকার মুসলমানের জীবন যাপন করছে, না এক আদর্শহীন লাগামহীন ও জড়বাদী জীবনের ভোগবিলাসে ডুবে আছে—তার খোঁজ-খবর রাখার কোন প্রয়োজন তারা মনে করে না। মেয়েকে যদি কোন ধনীর দুলালের সাথে বিয়ে দেয়া যায়, অথবা জামাই যদি হয় বড়ো চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী, তাহলে এদিক দিয়ে জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। মেয়ে যদি নর্তকী গায়িকা হয়, কোন চিত্র তারকা হয়ে অসংখ্য ভোগবিলাসী মানুষের চিত্তবিনোদনের কারণ হয়, তাহলে অনেক বাপ-মায়ের বুক খুশীতে ফুলে ওঠে। অবশ্যি যাদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই, তাদের এরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তায়ালাও বলেছেন ঃ

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلاً اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ـ

"খাও দাও মজা উড়াও কিছু দিনের জন্যে। কারণ তোমরা তো অপরাধী।"–(সূরা মুরসালাত ঃ ৪৬)

তারা পরকালের জীবনকে তো অস্বীকার করেছে। তারা মনে করে জীবন বলতে তো এ দুনিয়ার জীবনটাই। কিন্তু তারা মনে করলেও তো আর প্রকৃত সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না? পরকাল তো অবশ্যই হবে এবং সে জীবনে তাদের পাওনা তো আর কিছুই থাকবে না। পরকালের জীবনকে যারা মিথ্যা মনে করেছিল, তাদের সেদিন ধ্বংসই হবে।

এত গেল পরকাল যারা বিশ্বাস করে না তাদের ব্যাপার। কিন্তু যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে, তাদের আচরণও ঠিক ঐরূপই দেখা যায়। তাহলে কি চিন্তা করার বিষয় নয়?

অন্যদিকে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, তাদের অনুগত হওয়া, তাদের খেদমত করা তাদের জীবনে কোন দুঃখ-কষ্ট আসতে না দেয়া, সন্তানের কর্তব্য। অনেকে সে কর্তব্য পালন করে, আবার অনেকে করে না। যারা করে না তারা আলবৎ অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য ও লাঞ্ছনার যোগ্য। কিন্তু যারা কৃতজ্ঞতা পালন করাকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য মনে করে, তাদের এটাও কর্তব্য যে, পিতামাতার পরকালীন জীবন যাতে সুখের হয়, তার জন্যে চেষ্টা করা। তাছাড়া তাদের জীবদ্দশায় তাদের কোন দুঃখ কষ্ট দেখলে আদর্শ সন্তানও দুঃখে অধীর হয়ে পড়ে এবং পিতামাতার দুঃখ-কষ্ট দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তেমনি তাদের মৃত্যুর পর আদর্শ সন্তান এটাও করে যে, তার মা অথবা বাবা হয়তো বা কোন কষ্টে রয়েছে। বাস্তবে তখন আর কিছু করার না থাকলেও তাদের জন্যে সন্তান প্রাণ ভরে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করে। "হে পরোয়ারদেগার

তুমি তাদের উপর রহম কর যেমন তারা আমাকে ছোট বেলায় বড় স্নেহভরে লালন-পালন করেছেন।" এ দোয়াটাও আল্লাহ তায়ালাই শিখিয়ে দিয়েছেন। অতএব তাঁর শিখানো দোয়া আন্তরিকতার সাথে সন্তান তার বাপ-মায়ের জন্যে করলে অবশ্যই তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। এভাবেই সন্তান তার পিতামাতার হক সঠিকভাবে আদায় করতে পারে—তাদের জীবদ্দশাতেও এবং মৃত্যুর পরেও।

কিন্তু আমরা কি দেখি ? প্রায় তো এমন দেখা যায়, পিতা তার একাধিক স্ত্রী ও সন্তানকে সমান চোখে দেখতে পারে না। সম্পদ বন্টনে কম বেশী করে কাউকে তার ন্যায্য দাবী থেকে বেশী দেয়, কাউকে কম দেয়, কাউকে একেবারে বঞ্চিত করে। আবার কোন কোন সন্তান জড়বাদী জীবনদর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পিতাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে এবং ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে, পিতার কাছ থেকে সিংহভাগ লেখাপড়া করে আদায় করে নেয়। পিতা কোন স্ত্রীর নামে অথবা কোন সন্তানের নামে বেনামী সম্পত্তি করে রাখে। উভয় পক্ষেরই এ বড় অন্যায় ও অসাধু আচরণ। এর জন্যে আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন আযাবের সম্মুখীন উভয়কেই হতে হবে।

অতএব পিতামাতা যদি তাদের সন্তানের পরকালীন সুখময় জীবন কামনা করে এবং সন্তান যদি মা-বাপের আখেরাতের জীবনকে সুখী ও সুন্দর দেখতে চায়—তাহলে দুনিয়ার বুকে তাদের উভয়ের আচরণ হতে হবে এমন যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল শিখিয়ে দিয়েছেন।

পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে শিশুকাল থেকেই সন্তানের চরিত্র ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলা যাতে করে তারা পরিপূর্ণ মুসলমানী জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে কোন নেক সন্তান যদি পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট দেখে তাহলে তাদেরকে সৎ পথে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

উভয়ে উভয়ের দায়িত্ব যদি পুরোপুরি পালন করে তাহলে উভয়ের পরকালীন জীবন হবে অফুরন্ত সুখের। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তাহলে একত্রে একই স্থানে অনন্ত সুখের জীবন কাটাতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ○ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ○

"এমন জান্নাত যা হবে তাদের চিরন্তন বাসস্থান। তারা (ঈমানদার) স্বয়ং তাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের মা-বাপ, বিবি ও সন্তানগণের মধ্যে যারা নেক তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। চারদিক থেকে ফেরেশতাগণ আসবে খোশ আমদেদ জানাতে এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা দুনিয়াতে যেভাবে ধৈর্যের সাথে সবকিছু মুকাবেলা করেছো, তার জন্যে আজ তোমরা এ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছ। আখেরাতের এ আবাসস্থল কতোই না ভালো ?"

–(সূরা আর রাদ ঃ ২৩-২৪)

আরও বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

"আরশে এলাহীর ধারক ফেরেশতাগণ এবং যাঁরা তার চারপাশে অবস্থান করেন—সকলেই তাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তসবিহ পাঠ করেন। তাঁরা তাঁর উপর ঈমান রাখেন এবং ঈমান আনয়নকারীদের সপক্ষে মাগফেরাতের দোয়া করেন। তাঁরা বলেন, হে আমাদের রব ! তুমি তোমার রহমত ও এলম সহ সবকিছুর উপর ছেয়ে আছ। অতএব মাফ করে দাও এবং দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও তাদেরকে যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অবলম্বন করেছে। হে আমাদের রব ! প্রবেশ করাও তাদেরকে সেই চিরন্তন জান্নাতের মধ্যে যার ওয়াদা তুমি তাদের কাছে করেছিলে। এবং তাদের মা-বাপ, বিবি ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সালেহ (নেক) তাদেরকেও তাদের সাথে সেখানে পৌছিয়ে দাও। তুমি নিসন্দেহে মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ।–(সূরা মুমেন ঃ ৭-৮)

আল্লাহ তায়ালার উপরোক্ত এরশাদের অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার এবং এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সূরা তুরে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ط

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানেরও কোন না কোন স্তরে তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলেছে, তাদের সেসব সন্তানদেরকেও আমি তাদের সাথে মিলিত করে দেব। এতে করে তাদের আমলে কোন ঘাটতি আমি হতে দেব না।"-(সূরা আত তূর ঃ ২১)

সূরা মুমেনে বলা হয়েছে যে, ঈমানদার ও নেক লোক জান্নাতের সৌভাগ্য লাভ করবে। তখন তাদের চক্ষু শীতল করার জন্যে তাদের মা-বাপ, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তাদের সাথে একত্রে থাকার সুযোগ দেয়া হবে যদি তারা ঈমান আনার পর নেক আমল করে থাকে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের মতো আখেরাতের জীবনেও তারা বেহেশতের মধ্যে স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজনসহ একত্রে বসবাস করতে পারবে। সূরা তূরে অতিরিক্ত যে কথাটি বলা হয়েছে তা এই যে, যদি সন্তানগণ ঈমানের কোন না কোন স্তরে তাদের বাপ-দাদার পদাংক অনুসরণ করতে থাকে, তাহলে বাপ-দাদা যেমন তাদের উৎকৃষ্টতর ঈমান ও আমলের জন্যে যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে, তা তারা না করলেও তাদেরকে বাপ-দাদার সাথে একত্রে মিলিত করে দেয়া হবে। আর মিলিত করাটা এমন হবে না যেমন মাঝে মধ্যে কেউ কারো সাথে গিয়ে সাক্ষাত করে। বরঞ্চ তারা জান্নাতে তাদের সাথেই বসবাস করতে থাকবে। তারপর অতিরিক্ত এ আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, সন্তানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে বাপ-দাদার মর্যাদা খাটো করে নীচে নামিয়ে দেয়া হবে না বরং সন্তানের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে পিতার সাথে মিলিত করে দেয়া হবে।

যেমন ধরুন, পিতা-পুত্র উভয়ে ঈমান ও আমলের বদৌলতে জান্নাত লাভ করেছে। কিন্তু পিতা প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং পুত্র তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। এখন উভয়কে মিলিত করার জন্যে পিতাকে তৃতীয় শ্রেণীতে আনা হবে না, বরঞ্চ পুত্রকেই প্রমোশন বা পদোন্নতি দান করে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হবে এবং পিতার সাথে একত্রে বসবাস করার সুযোগ দেয়া হবে। অথবা পুত্র প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং পিতা নিম্ন শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও পিতাকে প্রমোশন দিয়ে পুত্রের সাথে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করে একত্রে বসবাসের সুযোগ দেয়া হবে। নেক বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার এ এক অসীম অনুগ্রহ ও উদারতার নিদর্শন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিষয়টি সকল মাতাপিতা ও সন্তানদের গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। উভয়ে উভয়ের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে শুধু তাদের পরকালীন জীবনই সুখী ও সুন্দর হবে না, বরঞ্চ এ দুনিয়ার বুকেও এক সুন্দর পূত-পবিত্র সমাজ ও পরিবেশ গড়ে উঠবে। দুষ্কৃতি, অনাচার অশ্লীলতার অস্তিত্ব থাকবে না এবং জান-মালের নিরাপত্তাসহ একটা ইনসাফ ভিত্তিক মানব সমাজ জন্ম লাভ করবে।

শেষ কথা

এখন শেষ কথা এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ যে নতুন জীবন লাভ করে এক নতুন জগতে পদার্পণ করবে তা এক অনিবার্য ও অনস্বীকার্য সত্য। এ শেষ জীবনকে সুখী ও আনন্দমুখর করার জন্যেই তো এ জগত। ইহজগত পরজগতেরই কর্মক্ষেত্র।

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

পৌষে নতুন ধানের সোনালী শীষে গোলা পরিপূর্ণ করার জন্যেই তো বর্ষার আগমন হয় আষাঢ় শ্রাবণে। যে বুদ্ধিমান কৃষক বর্ষার পানিতে আর সূর্যের রৌদ্র তাপে ভিজে-পুড়ে ক্ষেত-খামারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে-ই তার শ্রাবণের সোনালী ফসল লাভ করে হেমন্তের শেষে। এ দুনিয়াটাও তেমনি পরকালে ফসল লাভের জন্যে একটা কৃষিক্ষেত্র। যেমন কর্ম এখানে হবে, তার ঠিক তেমনি ফল হবে পরকালে।

পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র কুরআনের সর্বত্র মানুষকে বার বার তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর তৈরী মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। সে জন্যে তিনি চান মানুষ তার পরকালের অনন্ত জীবনকে সুখী ও সুন্দর করে তুলুক। আল্লাহর প্রতিটি সতর্কবাণীর মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর একান্ত দরদ ও স্নেহমমতা।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ج فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ○ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ج يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ○

"এ বিচার দিবস একেবারে অতি নিশ্চিত এক মহাসত্য। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রভুর কাছে তার শেষ আশ্রয়স্থল বেছে নিক। একটি ভয়ংকর শাস্তির দিন যে তোমাদের সন্নিকট, সে সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি এবং দিচ্ছি। প্রতিটি মানুষ সেদিন তার স্বীয় কর্মফল দেখতে পাবে। এ দিনের অবিশ্বাসী যারা তারা সেদিন অনুতাপ করে বলবে, হায়রে ! আমরা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ না করে যদি মাটি হতাম।"-(সূরা আন নাবা ঃ ৩৯-৪০)

এটাও উল্লেখ্য যে, খোদাদ্রোহী ও খোদা বিমুখ লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কোন বিদ্বেষ নেই, থাকতেও পারে না। তাঁর অনুগ্রহ কণার উপর নির্ভরশীল তাঁর সৃষ্টির উপর তাঁর বিদ্বেষ কি হতে পারে ? বরঞ্চ তাঁর অনন্ত দয়া ও অনুকম্পার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন তিনি চরম খোদাদ্রোহী ও পাপাচারীকে তাঁর দিকে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

একথাও মনে রাখা দরকার যে, এ উদাত্ত আহবানে তাঁর নিজের কোন স্বার্থ নেই।

مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَّمَآ أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ ○ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ○

"আমি তাদের (মানব ও জ্বীন জাতির) কাছে কোন জীবিকার প্রত্যাশা করি না। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমার পানাহারের ব্যবস্থা করুক। নিশ্চয় আল্লাহ জীবিকাদাতা ও অসীম শক্তিশালী।"

–(সূরা আয যারিয়াহ ঃ ৫৭-৫৮)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, জ্বীন এবং মানুষের সাথে তাঁর স্বার্থের কোন বালাই নেই। মানুষ খোদার দাসত্ব আনুগত্য করুক বা না করুক, তাঁর খোদায়ী এক চির শাশ্বত বস্তু। খোদা কারো দাসত্ব আনুগত্যের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। খোদার দাসত্ব করা বরঞ্চ মানুষের জন্মগত ও প্রাকৃতিক দায়িত্ব। এর জন্যেই তাদেরকে পয়দা করা হয়েছে। খোদার দাসত্ব আনুগত্য থেকে বিমুখ হলে তাদের প্রকৃতিরই বিরোধিতা করা হবে এবং ডেকে আনা হবে নিজেদেরই সর্বনাশ।

দুনিয়ার সর্বত্রই বাতিল খোদারা কিন্তু তাদের অধীনদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। তাদের আনুগত্যের উপরেই এ বাতিল খোদাদের খোদায়ীর ঠাঠ, ধন-দৌলতের প্রাচুর্য ও বিলাসবহুল জীবন নির্ভরশীল। তারা তাদের অনুগতদের জীবিকাদাতা নয়, বরঞ্চ অধীন এবং অনুগতরাই তাদের জীবিকা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের কারণ। অনুগত অধীন দেশবাসী বিদ্রোহী হলে তাদের খোদায়ীর প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ সকল জীবের জীবিকাদাতা ও পালনকর্তা।

তাহলে তাঁর দিকে ফিরে আসার বার বার উদাত্ত আহ্বান কেন ? তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে চান যদি তারা ফিরে আসে তাঁর দিকে।

তিনি চান তাঁদেরকে তাঁর অনুগ্রহ কণা বিতরণ করতে।

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ○ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ○ اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

"এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন খোদাকে অংশীদার বানায় না, মানুষ হত্যা করে না, অবশ্যি ন্যায়সংগত কারণে করলে সে অন্য কথা এবং যারা ব্যভিচার করে না, (তারাই আল্লাহর প্রকৃত প্রিয় বান্দাহ্) এবং যারা তা করে, তারা এর পরিণাম ভোগ করবে। কিয়ামতের দিনে তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে। এবং এ শাস্তির স্থান জাহান্নামে তারা বসবাস করবে চিরকাল এবং লাঞ্ছিত অবস্থায়। কিন্তু যারা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করতে থাকে, আল্লাহ তাদের পাপের স্থলে পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন। এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও দয়ালু।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৮-৭০)

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ ক্ষমা ঘোষণার পূর্বে তিনটি অতি বড় বড় পাপের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

এক ঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে বিপদে-আপদে সাহায্যের জন্যে, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে ডাকা—যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়েছে শির্ক। পাপের মধ্যে সেরা পাপ এই শির্ক।

দুই ঃ তারপর হলো অন্যায়ভাবে হত্যা করা। এটাও এতবড় পাপ যে, এর জন্যে কাফের মুশ্‌রিকদের মতো চিরকাল জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ○

"এবং যে ব্যক্তি মোমেনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার পরিণাম হলো জাহান্নাম, যেখানে তাকে থাকতে হবে চিরকাল। এবং আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত এবং তাকে অভিসম্পাৎ করবেন এবং তার জন্যে নির্ধারিত করবেন কঠোর শাস্তি।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৯৩)

আল্লাহ্ মানব সমাজে পূর্ণ শান্তি-শৃংখলা দেখতে চান এবং দেখতে চান প্রতিটি মানুষের জান-মাল ইজ্জত আবরুর পূর্ণ নিরাপত্তা। এর ব্যতিক্রম তাঁর অভিপ্রেত কিছুতেই নয়। তাই তিনি বলেন ঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط

"যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যার অপরাধ ব্যতীত অথবা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করার অপরাধ ব্যতীত হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করলো এবং যে ব্যক্তি একটি মানুষের জীবন রক্ষা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করলো।"-(সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৩২)

আল্লাহ্ মানুষের রক্ত একে অপরের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। তার জন্যে উপরের ঘোষণা ও কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

তিন ঃ বড় বড় পাপের মধ্যে আর একটি পাপের কথা আল্লাহ্ উপরে ঘোষণা করেছেন। তাহলো ব্যভিচার।

কিন্তু মহান ও দয়ালু আল্লাহ্ এসব পাপ করার পরও পাপীদেরকে আশার বাণী শুনিয়েছেন। অনুতপ্ত ও প্রত্যাবর্তনকারী (তওবাকারী) পাপীর পাপের স্থলে পুণ্যের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। অর্থাৎ পাপ করার পরও যদি কোন ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে খোদার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, পাপ কাজ পরিত্যাগ করে, পরিপূর্ণ ঈমান আনে এবং নেক কাজ করা শুরু করে, তাহলে নামায়ে আমলে লিখিত পূর্বের পাপরাশি মিটিয়ে দিয়ে তথায় সৎকাজ লিখিত হয়। তার মনের আবিলতা ও কলুষ কালিমা দূর হয়ে যায় এবং হয় সুন্দর, স্বচ্ছ ও পবিত্র। পরিবর্তিত হয় তার ধ্যান-ধারণা, মননশীলতা ও রুচি। সে হয় আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহ ও করুণার অধিকারী। পাপীদের জন্যে এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কি হতে পারে ?

তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছে পাপ করার পর যদি তওবা করে এবং ঈমান আনে। ঈমান আনা কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঈমান আনার অর্থ শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের উপর ঈমান নয়। বরঞ্চ তার কেতাবের উপরও। আল্লাহর কেতাবে হারাম ও হালাল, পাপ ও পুণ্য, সত্য ও মিথ্যা, সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তার বর্ণিত হারামকে হারাম, হালালকে হালাল, পাপকে পাপ এবং পুণ্যকে পুণ্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। পাপকে পাপ মনে করলেই তার জন্যে অনুতাপ অনুশোচনা হওয়া স্বাভাবিক। পাপ করার পরও অনেকে তাকে পাপ মনে করে ন

নরহত্যা ও ব্যভিচার করার পর তার জন্যে অনুতাপ করার পরিবর্তে তা নিয়ে গর্ব করে এবং অপরের কাছে প্রকাশ করে আনন্দ পায়। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত প্রতিটি বিধি-বিধান মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তার কাছে মাথানত করতে হবে। কুরআনকে গোটা জীবনের জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিতে হবে। তারপরই তওবা এবং সৎকাজ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। যাহোক পাপীদের জন্যে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবার পথ সকল সময়েই উন্মুক্ত রয়েছে। এ আল্লাহর অসীম দয়া ও অনুকম্পারই নিদর্শন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তওবাকারী বান্দাহর প্রতি কি পরিমাণ আনন্দিত হন তা বুঝবার জন্যে নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেছেন যে, আল্লাহর নবী বলেন, 'যখন কোন বান্দাহ আল্লাহর কাছে খাঁটি দেলে তওবা করে, তখন তিনি অধিকতর আনন্দিত হন সে ব্যক্তি থেকে যে একটি জনহীন প্রস্তরময় প্রান্তর অতিক্রম করা কালে তার বাহনের পশুটি হঠাৎ হারিয়ে ফেলে। বাহনটির পিঠে তার খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার ছিল। বহু অনুসন্ধানের পর সে হতাশ হয়ে একটি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। নৈরাশ্য ও দুঃখে সে ভেঙে পড়ে। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ দেখতে পায় তার হারিয়ে যাওয়া পশুটি সমুদয় দ্রব্য সম্ভারসহ তার সামনে দণ্ডায়মান। সে তার লাগাম ধরে ফেলে এবং আনন্দের আতিশয্যে তার মুখ দিয়ে এ ভুল কথাটি বেরিয়ে পড়ে "হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দাহ এবং আমি তোমার রব।"–(মুসলিম)

এ ব্যাপারে আর একটি হাদীস এখানে উল্লেখ্য। হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেছেন ঃ

একবার কিছু লোক যুদ্ধবন্দী হয়ে নবীর (সা) দরবারে এলো। তাদের মধ্যে ছিল একটি স্ত্রীলোক যার দুগ্ধ পোষ্য সন্তান ছাড়া পড়েছিল। স্ত্রীলোকটি কোন শিশু সন্তানকে সমানে দেখতে পেলেই তাকে তার বুকে জড়িয়ে ধরে স্তন্যদান করতো। নবী (সা) তার করুণ অবস্থা দেখে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি কখনো ভাবতে পারো যে, এ স্ত্রীলোকটি তার আপন শিশুকে স্বহস্তে আগুনে নিক্ষেপ করবে ?"

আমরা বললাম কখনোই না। স্বহস্তে আগুনে নিক্ষেপ করাতো দূরের কথা কেউ নিজে নিজে পড়তে গেলেও সে তাকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটিই করবে না।

নবী বললেন ঃ

اَللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا ـ

"এ স্ত্রীলোকটি তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়ালু, তার চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি।"-(তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদের তফসীর দ্রঃ)

দেখুন, আল্লাহ তায়ালা কত বড় দয়ালু এবং মানুষ কত বড় নাফরমান অকৃতজ্ঞ।

অতএব কেউ প্রবৃত্তির তাড়নায় অতিমাত্রায় পাপ করে থাকলেও তার নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই। তার উচিত কাল বিলম্ব না করে অনুতপ্ত হৃদয়ে খোদার দিকে ফিরে যাওয়া এবং পাপ পথ পরিত্যাগ করে তাঁরই দাসত্ব আনুগত্যে নিজকে সঁপে দেয়া। খোদার দেয়া জীবন বিধানকে ত্যাগ করে মানব রচিত জীবন বিধানে যারা বিশ্বাসী এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদের (সা) নেতৃত্ব ত্যাগ করে খোদাহীন নেতৃত্বের মোহে যারা ছুটে চলেছে তাদের উচিত সময় থাকতে আল্লাহর রসূলের দিকে ফিরে আসা।

নবী বলেছেন, তাড়াহুড়ো শয়তানের কাজ। শুধু পাঁচটি ব্যাপারে তা ভালো। (১) মেয়ে সাবালিকা হলে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া। (২) ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ আসামাত্র তা পরিশোধ করা। (৩) মৃত্যুর পর অবিলম্বে মুর্দাকে দাফন করা। (৪) মেহমান আসা মাত্র তার মেহমানদারী করা। (৫) পাপ করার পরক্ষণেই তওবা করা।

এখনই তওবা করে কি হবে ? আর কিছুদিন যাক। বয়সটা একটু পাকাপোক্ত হোক। এখন তওবা করে তা ঠিক রাখা যাবে না ইত্যাদি—এসব কিছুই শয়তানের বিরাট ধোঁকা।

জীবনের কোন একটি মুহূর্তেরও ভরসা নেই। কথিত আছে হযরত ঈসা (আ) বলেছেন, "দুনিয়া শুধু তিন দিনের। গতকাল তো চলেই গেছে তার কিছুই তোমার হাতে নেই। আগামী কাল তুমি থাকবে কিনা, তা তোমার জানা নেই। শুধু আজকের দিনটিই তোমার সম্বল। অতএব আজকের দিনটিকেই তুমি সম্বল মনে করে কাজে লাগাও।"

কতবড় মূল্যবান কথা। কিন্তু শয়তানের ধোঁকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে অনেকের জীবনাবসান হয়ে যায়। সে আর তওবা করার সুযোগই পায় না। তার ফলে পাপের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে তার মৃত্যু হয়।

আর একটি কথা। যারা মনে করে যে ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে তও করে ধর্ম কর্মে মন দিলেই চলবে। এত সকাল সকাল ধার্মিক সেজে ক নেই।

তারা যে কতখানি আত্মপ্রবঞ্চিত তা তারা বুঝতে পারে না। কারণ পাপ করতে করতে তাদের মন এমন কঠিন হয় যে, তওবা করার মনোভাব আর কোন দিন ফিরে আসে না। আর পাপ করা অবস্থাতেই হঠাৎ মৃত্যু এসে গেলেই বা তারা তাকে ঠেকাবে কি করে?

অতএব ওসব চিন্তা যে শয়তানের ধোঁকা প্রবঞ্চনা তাতে সন্দেহ নেই। এর থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন, আমীন।

তওবা করার পর আল্লাহর নির্দেশিত ভালো কাজগুলো কি কি তা জানার জন্যে কুরআন হাদীসের জ্ঞান অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন। আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে নামায কায়েম করা। আল্লাহ মানুষকে যত কাজের আদেশ করেছেন তার সর্বপ্রথমটি হচ্ছে নামায। খোদার প্রতি ঈমানের ঘোষণা ও আনুগত্যের স্বীকৃতির প্রথম নিদর্শনই নামায। খোদার এ ফরয কাজ নামাযকে যারা লংঘন করলো, তারা আনুগত্য অস্বীকার করলো বুঝতে হবে এবং তারপর খোদার অন্যান্য ফরয আদায় তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। আখেরাতে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির হিসাব নেয়া হবে তাহলো নামায। পরীক্ষার এ প্রথম ঘাঁটি উত্তীর্ণ হলে অন্যান্য ঘাঁটিগুলো অধিকতর সহজ হবে। আর প্রথম ঘাঁটিতেই অকৃতকার্য হলে অপরাপর ঘাঁটিগুলো অধিকতর কঠিন হবে।

নামাযের হাকিকত বা মর্মকথা ভালো করে জেনে নিতে হবে। তার সংগে যাকাত, রোযা, হজ্জ মোটকথা আল্লাহর প্রতিটি হুকুম নির্দেশ ভালো করে জেনে নিয়ে পালন করে চলার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে।

সর্বদা একটি কথা মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালার কতকগুলো নির্দেশ ব্যক্তিগত জীবনে অবশ্য পালনীয়। যথা নামায কায়েম করা, রমযানের রোযা রাখা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা ও অতিরিক্তভাবে দান খয়রাত করা ; ইসলামের পথে অর্থ ব্যয় করা, বৈধ উপায়ে উপার্জন ও ব্যয় করা, হিংসা বিদ্বেষ অহংকার পরনিন্দা না করা ইত্যাদি।

আর কতকগুলো নির্দেশ এমন আছে যা পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সমাজ ও গোটা মাববজাতির সাথে সম্পর্ক রাখে। সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করা ও তাদের হক আদায় করা, কারো প্রতি অন্যায় অবিচার না করা, অপরের হক নষ্ট না করা ইত্যাদি। এগুলোও পালন না করে উপায় নেই। মানুষের কোন কিছুই ব্যক্তি স্বার্থ কেন্দ্রিক হওয়া কিছুতেই চলবে না। তাই পিতার কর্তব্য তার অধীন সন্তানদেরকে আল্লাহর পথে চলার জন্য তৈরী করা। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যও তাই। মানুষ তার আপন স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। তাদের

সামান্য অসুখ-বিসুখ বা দুঃখ-কষ্ট তার সহ্য হয় না। অতএব তাদের মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবন সুখী ও সুন্দর হওয়া কি তার বাঞ্ছনীয় নয় ? কিন্তু অধিকাংশই এ সম্পর্কেও উদাসীন।

অতপর আপন পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে বাইরের সমাজে ইসলামের দাওয়াত ও তবলিগের কাজ করতে হবে। ঠিক তেমনি একটি মুসলিম রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে। এটা তার পালনীয় কর্তব্য।

অন্যায় অবিচার, অনাচার পাপাচার সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে বন্ধ করার চেষ্টা না করলে পার্থিব জীবনেও খোদার তরফ থেকে যেসব বিপদ মুসিবত আসে শুধু যালেমদের উপরই পতিত হয় না, বরঞ্চ ঐসব সৎ ব্যক্তিদের উপরেও যারা তা বন্ধ করার চেষ্টা করেনি।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ج

"সে বিপদ মুসিবতে তোমরা অবশ্যই ভয় করবে যাতে কেবল মাত্র তারাই নিমজ্জিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে যুলুম করেছে।"

−(সূরা আনফাল ঃ ২৫)

আবার কুরআন পাক আলোচনা করলে এটাও জানা যায় যে, যারা সর্বদা খোদার পথে চলেছে, ইসলাম প্রচারের কাজ করেছে, করেছে 'আমর বিল মা'রুফ' (ভালো কাজের আদেশ) ও 'নাহি আনিল মুনকারের' (মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা) কাজ, তারপর খোদা এক শ্রেণীর লোকের পাপের জন্যে আযাব নাযিল করলেও যারা উপরোক্ত সৎকাজ করেছে, তাদেরকে তিনি বিচিত্র উপায়ে রক্ষা করেছেন। অতএব দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ থেকে বাঁচতে হলে সে পথ অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অতপর মৃত্যু যবনিকার ওপারে বা আখেরাতের আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থখানি শেষ করার আগে আর একটা কথা বলে রাখি।

ঈমান হচ্ছে বীজ স্বরূপ এবং আমল তার বৃক্ষ ও ফল। আখেরাতের বিশ্বাস যতো বেশী দৃঢ় হবে, আমলের বৃক্ষও ততবেশী সুদৃঢ় এবং শাখা প্রশাখা ও ফুলে ফলে সুশোভিত হবে।

আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ঈমান হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার একটা চুক্তি। সে চুক্তির সারমর্ম এই যে, যেহেতু আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা

এবং বাদশাহ এবং মানুষ তার জন্মগত গোলাম ও প্রজা, অতএব গোলাম ও প্রজা তার জীবনের সব ক্ষেত্রে একমাত্র তার প্রভু ও বাদশার আদেশ নিষেধ ও আইন-কানুন মেনে চলবে। স্রষ্টা, প্রভু ও বাদশার আইন মানার পরিবর্তে অন্য কারো আইন মেনে চলা—যে তার স্রষ্টাও নয় প্রভু এবং বাদশাহও নয়—হবে বিশ্বাসঘাতকতা করা, নিমকহারামি এবং চরম নির্বুদ্ধিতা এবং তা হবে চুক্তি লংঘনের কাজ।

আবার খোদার আইন পালনে অথবা জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব আনুগত্য পালনে যে শক্তি বাধাদান করে তাহলো তাগুতি শক্তি এবং কৃত্রিম খোদায়ীর দাবীদার শক্তি। খোদার সাথে বান্দাহর সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করতে হলে এ তাগুতি শক্তিকে উৎখাত করাও চুক্তির অনিবার্য দাবী। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ও বিষয়ের সাথে মানুষের জীবন-জীবিকা সুখ-দুঃখ জান-মাল ও ইজ্জত আবরুর প্রশ্ন ওতপ্রোত জড়িত এক কথায় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অংগন, যুদ্ধ, সন্ধি, শত্রুতা, বন্ধুত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন শাসন ও প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ঈমানের দাবী। এ দাবী আদায়ের সংগ্রামকে বলা হয়েছে "আল জিহাদু ফী সাবিলিল্লাহ"—আল্লাহর পথে জিহাদ। আর এর সফল পরিণতিই হলো 'একামতে দ্বীন'—দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা, যার জন্যে হয়েছিল সকল নবীর আগমন। আখেরাতের সাফল্যের জন্যে এ কাজ অপরিহার্য। শেষ নবীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এ কাজের জন্যেই ব্যয়িত হয়েছে এবং তাঁর এ কাজের পূর্ণ অনুসরণই প্রকৃত মুমেনের একমাত্র কাজ। এরই আলোকে একজন মুমেনের সারা জীবনের কর্মসূচী নির্ধারিত হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

সর্বশেষে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমাদের কাতর প্রার্থনা। তিনি যেন আমাদেরকে উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের পূর্ণ তওফিক দান করেন। সকল প্রকার গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র রেখে তাঁর সেরাতুল মুস্তাকীমে চলার শক্তি দান করেন। অবশেষে যেন তাঁর প্রিয় বান্দাহ হিসেবে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারি। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ